॥ প্রকাশকের কথা ॥

পণ্ডিতেরা বলে থাকেন যে বাঙালী জাতির উৎসমূলে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব বড় অধিক। তাই বোধ হয় আমাদের 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান্'। সেই কারণেই মা ডাক আমাদের প্রণব মন্ত্র। আমাদের মা ডাক ডেকে যেন আর তৃপ্তি নেই, শুনেও যেন আর আশ মেটে না। বাঙালীর মত এত মধুর স্বরে মা ডাকতে বোধ হয় আর কেউ পারে না। আমরা তাই সর্বত্রই মায়ের ছবি দেখতে পাই, আমাদের সব কিছুই মায়ের স্পর্শে পবিত্র এবং আনন্দময়।

প্রখ্যাত গবেষক, সবার প্রিয় অধ্যাপক ও রসপিপাসু গ্রন্থকার স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালীর ঐতিহ্য-সূত্র ধরে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে থেকে কতকগুলি বড় সুন্দর, পরম পবিত্র মায়ের ছবি সংগ্রহ করে এনেছেন। এ জিনিষ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ—এভাবে দেখাও আর কোন দিন হয় নি। তাই অনেক আশা নিয়ে, যে মা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা—সেই মায়ের কথা আমরা মাতৃভক্তি-গদগদ বাঙালীর হাতে তুলে দিলাম। সকলের সঙ্গে আমাদের মাতৃপূজা সার্থক হোক। মায়ের পায়ের কাছে রাখা একটি ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ের প্রণাম ফুলের মতো ফুটে উঠুক।

'দুনিয়ার সার। ভালবাসা মার ॥'

॥ সূচীপত্র ॥

১. 'শাঁখার আগে সোনার কাঁকণ।
মায়ের বুকে পুতের নাচন ॥'

২. 'মায়ে জানে পুতের বেদন অন্যে জানব্ কি।
মায়ের বুকের লৌ পুত্র আর ঝি ॥'

৩. 'মায়ের রাও পবনের বাও
এমন শীতল নাই।'

কথামুখ

স্নেহময়ী মায়ের চিত্র সব দেশেই এক। মাতৃহৃদয়ের গতিপ্রকৃতিও সর্বত্র সমান। স্নেহের উতলতা ব্যাকুলতা শঙ্কা উদ্বেগ কোন্ মা না অনুভব করেন? তবু দেশভেদে পার্থক্য দেখা দেয়। একই ফুল, দুই দেশের মাটির গুণে ভিন্ন হয়। বাংলার মা শুধু বাঙালীরই মা।

বাংলাদেশ মাতৃতান্ত্রিক দেশ। একদিন এদেশের গৃহ ও সমাজ মায়ের নিয়ন্ত্রণেই গড়ে উঠত। কালক্রমে সে সমাজের উপর পুরুষ-প্রধান আর্যসমাজের প্রভাব পড়েছে। ফলে বাইরের কর্মাঙ্গনে পুরুষই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন, মায়ের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে অন্তঃপুরে। এই নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করেই মা তাঁর বাৎসল্যকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সন্তানের মধ্যে। লালনে-পালনে মা-ই সর্বেসর্বা।

এ দেশের মায়ের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এ দেশের প্রকৃতির ছবি। বাংলার মা বঙ্গ-প্রকৃতির প্রতিকৃতি। কখনও তাঁর শীতের তাপসী মূর্তি, কখনও মুখে বসন্তের উচ্ছলতা, কখনও চোখে বর্ষার প্লাবন, আবার কখনও শরতের প্রশান্ত হাসি। মায়ের মুখ যেন উদার আকাশ, চোখ দুটি জোড় কমল, বুকে গঙ্গা-মধুমতীর ধারা। বাংলার মাটির মিষ্টি গন্ধ দিয়ে গড়া বাঙালী মায়ের চিন্ময়ী রূপ।

বাংলার ছায়ানিবিড় প্রকৃতি গভীর শান্তির নীড়। নিদাঘতপ্ত দিনে এই ছায়া আশ্রয় করে ক্লান্ত মানুষ, বেলা অবসানে এই নীড়ে পাখা গুটায় শ্রান্ত পাখী। তেমনই সকল জ্বালাজুড়ানো মায়ের কোল। মায়ের বোলেও কত না শান্তি। গ্রাম-বাংলার কবিরা বলেন, 'মায়ের রাও পবনের বাও'।

মায়ের হাসিটিও বড় মধুর। বুকের অঢেল স্নেহ মুখে হাসি হয়ে

ঝরে। স্বভাবজগতেও এ-হাসির অভাব নাই। প্রথম উষার সাদা হাসি, সন্ধ্যাতারার মৃদু হাসি, পূর্ণ চাঁদের উছল হাসি যেন মায়ের মুখেরই হাসি। মায়ের কাছ থেকেই কি এ হাসি চুরি করে প্রকৃতি? তবু এই সর্বমধুর মাতৃমূর্তির দিকে তাকিয়ে কেন যেন দুচোখ জলে ভরে আসে। মায়ের স্নেহভরা মুখখানি বড় করুণ। তাঁর সোহাগে কোথায় যেন বেদনার ছোঁয়া। শিশিরঢাকা চাঁদের মত, জলে ভেজা সবুজ ধানের মত বাংলার মায়েদের মুখ। স্নিগ্ধ অথচ সজল, মধুর অথচ ছলছল। যেন, 'কাঁদিতে সৃজিলা বিধি অভাগী মায়েরে।'

কেউ কেউ মনে করেন, অভাবের তাড়নাই এই দুঃখের কারণ। বেশির ভাগ বাঙালীর সংসার অভাব-অনটনের সংসার। মাকেই এই অভাবের দায় বহন করতে হয়। তাই স্নেহময়ী মায়ের দুঃখিনী মূর্তি। হাজার বছরের পুরানো একজন কবি সংস্কৃত ভাষায় বাঙালী মায়ের যে-ছবি এঁকেছেন, দেশী ভাষায় তার মর্মার্থ এই রকম দাঁড়ায়—

মায়ের দেহটি দীঘল ও শীর্ণ। পরনে ছেঁড়া কাপড়।
খাবারের অভাবে শিশুদের পেট-পড়া, চোখ কোটর-
গত। তাঁরা কাঁদে। দীন-দুঃখিনী মা। চোখের
জলে তার মুখ ভেসে যায়। মুষ্টিমেয় চাল
হাতে নিয়ে তিনি ভাবেন, এই চালে
তিন মাস চালানো যায় কি না।

বাংলার ব্রতকথা রূপকথাতেও দেখা যায়, মায়েরা দীনদুঃখিনী। কোন মা রানী হয়েও দুয়োরানী। কোন মা বনবাসী। কোন মা ঘুঁটেকুড়ানী দাসী। কুঁড়েঘরে তাঁরা থাকেন, কোনদিন খেতে পান, কোনদিন পান না। এঁরা সবাই দুঃখে-দারিদ্র্যে পীড়নে পীড়িতা। যেন পাথরচাপা 'মা জননী ভোগবতী'—অশ্রুময়ী মা 'ঘুমিয়ে যেন আছেন আপন চোখের জলে ভেসে।'

কিন্তু অভাব-দারিদ্র্যই কি সব? বাঙালী মায়েদের অনেকে অমেয় ঐশ্বর্যের অধিকারিণী। ধর্মমঙ্গলের রানী রঞ্জাবতীর 'সম্পদ সম্মান সুখ'—কোনটিরই অভাব ছিল না। তবু তিনি অশ্রুময়ী। আবার যাঁদের সম্পদ নাই, তাঁরাও শিশুকে নিয়ে স্বর্গ রচনা করেন। শিশুকে ঘিরে মায়ের বুকে 'কত স্বপন ভাসে, কত স্বপন হাসে।' কুঁড়েঘরে চাঁদের হাট বসে, আস্তাকুঁড়ে চাঁপা ফুল ফোটে।

মনে হয়, অভাব নয়, গভীর মমতাই বাঙালী মায়ের দুঃখের কারণ। যে মা যত 'স্নেহবিহ্বল' তিনি তত 'করুণা-ছলছল।' যেখানে স্নেহ যত অধিক, সেখানে আশংকা, উদ্বেগ ও বেদনাবোধ তত অধিক। বাঙালী মায়ের হৃদয় স্নেহের অকূল অতল সাগর। বিশাল সাগর যেমন সামান্য কারণে তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়, বঙ্গজননীর অন্তরও তেমনই অল্প কারণে বেদনায় ফুলে ফুলে ওঠে। স্নেহাধিক্যেই বাঙালীর মা শঙ্কাভীত, স্পর্শকাতর ও ক্রন্দনমুখর।

মা মেনকা ও যশোমতীর চিত্র ভারতীয় সাহিত্যেও আছে, বাংলা সাহিত্যেও আছে। কিন্তু বাঙালী কবির কলমে আঁকা মেনকা ও যশোদা কারুণ্যের অশ্রুমতী প্রতিমা। শুধু মেনকা-যশোদা নন, যে-কোন বঙ্গজননী করুণ বাৎসল্যের বিগ্রহ। রূপকথায় দেখি, রাজকুমার মদন মৃগয়ায় যাবে। শুনেই রাজা সিংহাসন থেকে টাল খেয়ে পড়লেন, আর—

> 'রানী আলুথালু। এ-মন্দিরের আশীর্বাদ, ও-মন্দিরের ধুলা
> নিয়া মদনের মাথায় দেন।'

বাঙালী জননী নদীমাতৃক বাংলার পূর্ণ প্রতিরূপ।

স্নেহের এই আতিশয্য অনেক ক্ষেত্রে বাংলার মাকে স্নেহান্ধ করে রেখেছে। সন্তানের সহস্র অপরাধকে তিনি অপরাধের মধ্যেই গণ্য করেন না। যেমন, নিমাই-জননী শচীমাতা। সংসারে অভাব,

নিমাই তা বোঝেন না। কিছু চেয়ে না পেলেই, মুহূর্তে ঘরদোর তছনছ করেন। একদিন স্নানের সময় মালা-চন্দন চেয়েছেন। ঘরে মালা নাই—বলাতেই চপল শিশু ক্রুদ্ধ হয়ে ঘরের তেল-ঘি-লবণের পাত্র চূর্ণ করে ফেললেন, শিকা টেনে নষ্ট করলেন চাল, ধান, মুগের বড়ি, খান্ খান্ করে ছিঁড়ে ফেললেন মায়ের পরার কাপড়। কিন্তু বাৎসল্যময়ী শচীদেবী ক্রুদ্ধ না হয়ে শুধু বললেন—

ভাল হৈল বাপ্! যত ফেলিলা ভাঙিয়া!
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া॥

কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ঠিক স্নেহান্ধতা নয়, স্নেহের সর্বংসহা ছবিখানিই চোখের সামনে ভাসে। বঙ্গজননী ধৈর্যে মাটির মত সহিষ্ণু, তরুর মত ধীর ও পাথরের মত শক্ত। ছেলের বালাই দূর করতে তিনি যে-কোন ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত।

বাঙালী মায়ের স্নেহান্ধতা, মাকে স্বার্থপর ও একচোখো করে তুলেছে—এমন অভিযোগও কেউ কেউ করে থাকেন। নিজের ছেলের প্রতি আদরবশে তিনি পরের ছেলেকে অনাদর করেন। প্রচলিত একটি ছড়াতে আদরার্থক ও তুচ্ছার্থক নির্দেশকের প্রয়োগে মায়ের মনের এই ভাবকে রূপ দেওয়া হয়েছে—

'পরের ছেলে ছেলেটা, খায় যেন এতটা,
চলে যেন বাঁদরটা।
নিজের ছেলে ছেলেটি, খায় যেন এতটি
চলে যেন ঠাকুরটি॥'

কিন্তু বাংলার মায়েদের নিজের ছেলের প্রতি এই স্নেহের আবেগ, ঠিক স্বার্থান্ধতা বা ঈর্ষাকাতরতার পর্যায়ে পড়ে না। স্নেহের এক-মুখীনতাই এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। অম্বিনী জননীর অন্ধ আবেগ বরং

কৌতুক-হাস্যের উপাদান। নিজের ছেলেকে নিয়ে পরের প্রতি বক্রোক্তি নির্মল কৌতুকের লহর মাত্র। ছড়ার মা যখন বলেন —

ধন ধন ধনিয়ে
কাপড় দেব বুনিয়ে
তাতে দেব হীরের টোপ,
ফেটে মরবে পাড়ার লোক।

—তখন মায়ের এই কল্পিত মানগর্বকে কোনক্রমেই অভিমানের অহঙ্কার বলা চলে না।

কেউ কেউ অনুযোগ করেছেন, বাংলার মায়ের স্নেহ বাঙালীকে মানুষ করেনি, ঘরকুনো করে রেখেছে। একথা সর্বাংশে সত্য নয়। স্নেহের শক্তি অসাধারণ। স্নেহের কোমল স্পর্শে অশান্ত ঔদ্ধত্য শান্ত হয়, শিলা সোনা হয়ে ওঠে। এই স্নেহের অভাবে শিশু হয় দুর্ধর্ষ ডাকাত। তার উদাহরণ দস্যু কেনারাম।

মায়ের স্নেহ শুধু স্নেহাঞ্চলে বেঁধে রাখে না, সন্তানকে সুদূরের পিয়াসী করে তোলে। রূপকথায় দেখা যায়, রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে দুঃসাহসিক অভিযানে বের হয়েছে, সওদাগর পুত্র চৌদ্দ ডিঙা মধুকর নিয়ে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। রাক্ষস-খোক্ষসদের বিরুদ্ধে এদেশের ছেলেদের যে সংগ্রাম, তা রূপকাশ্রিত সত্য। যে-কোন অভিযানাত্মক কর্মের পিছনে রয়েছে মায়ের প্রেরণা। লাটাইয়ের সুতার মত মায়ের স্নেহ। তা কাছেও টানে, দূরেও উড়িয়ে দেয়। যে-মাতৃস্নেহ সন্তানকে ঘরমুখী করে, সেই স্নেহই আবার তাকে দূরের অভিযানে যাত্রা করায়। শীত-বসন্তের মা, শঙ্খ সওদাগরের মা তার দৃষ্টান্ত।

প্রয়োজনবোধে বাংলার মা মরণান্তিক যুদ্ধে সন্তানকে প্রেরণ

করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। ধর্মমঙ্গলের লক্ষ্যা ডুমুনী তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

বস্তুত, বিঘ্ন-বিপদকে তৃণজ্ঞান করার যে প্রেরণা, তা চির-দুঃখসহিষ্ণু বাঙালী মায়েরই প্রেরণা। মাতৃপ্রেম বৃহৎ প্রেমের নেশা ধরিয়ে দেয়। প্রেমের ঠাকুর গৌড়ের গৌরাঙ্গ বলেছিলেন, তিনি অনুরাগে প্রেমের ভিখারী। এই অনুরাগের প্রথম দীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন মায়ের কাছে।

বাঙালী মায়েদের আরও দুটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার মত। ছড়াগুলিতে মায়ের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে মা কবি। তাঁর রস-রসিকতা ও কল্পনায় ভরা বাংলার ছেলে-ভুলানো ছড়া। আবার ব্রতের মায়েদের ভিতর রয়েছে চিত্রশিল্পী-সুলভ গুণ। বাঙালীর ভাব ও কল্পনাপ্রবণতা এবং সৌন্দর্যবোধ—এগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে মায়েদের কাছ থেকেই পাওয়া।

'বাংলার মায়েদের সবচেয়ে বড় সম্পদ বুকভরা স্নেহ। এমন সোহাগ বুঝি অন্যত্র দুর্লভ।' মায়ের স্নেহের সম্বোধনগুলির মধ্যেও সেই সোহাগের স্পর্শ। বাংলা ভাষাভাণ্ডারে এগুলি মাতৃস্নেহের দান। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কারে তাদের অপূর্ব শোভা। আকাশ বা আসমানের চাঁদ সন্তান বিষয়ে একটি সাধারণ উপমা। শুধু চাঁদ নয়, মায়ের কাছে শিশু হল—পূর্ণচাঁদ, পদ্ম, মাসির চান, সোনার চাঁদ, চাঁদের শিরোমণি। সূর্যতারার রূপকও বাদ যায় না—

চাঁদ সুরজ তারা।
মায়ের বুক জোড়া॥

পুতুল নিয়েও অনেক রূপক। মায়ের স্নেহের দৃষ্টিতে নধর সন্তান হয়েছে—'ননীর পুতুল', 'ক্ষীরের পুতুল', 'চন্দনের পুতুল'। ফুলের সাদৃশ্যও অল্প নয়। শিশু 'পদ্মের কলি', 'চাঁপার কুঁড়ি', 'ফুলের

প্রতিমা'। ধন-দৌলতের সেরা ধন সন্তান। মায়ের কাছে শিশু 'ধন-ধনা', 'চোখের মণি', 'সাত রাজার ধন', 'সাগরছেঁচা মাণিক'। শিশুই মায়ের একমাত্র সম্বল – সে 'অন্ধের নড়ি'। শিশু মায়ের তপস্যার ফল 'সাধনার ধন'। তাই সন্তান 'ষষ্ঠীর কৃপা', 'শিবরাত্রির সল্‌তে'।

বাংলার মাতৃমূর্তি বহু বিচিত্র। লালন-পালনে, সোহাগে, কৌতুকে তাঁর অসংখ্য রূপ। স্নেহই তাঁদের মুখ্য হৃদয়বৃত্তি। এই স্নেহ আবার অবস্থাবিশেষে – দুঃখে, দৈন্যে, চিন্তায়, উদ্বেগে, হর্ষে, হাস্যে ও উৎসাহে শতরূপা। এ দেশের সন্ধ্যার আকাশে পাতলা মেঘের উপর অস্তসূর্যের সাতরঙা আলো ঠিকরে পড়ে। ফলে অসংখ্য বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। তেমনই বাংলার মায়েদের স্নেহপূর্ণ হৃদয়টিতে নানা ভাবের প্রতিবিম্ব পড়ে। ফলে শত শত অভিনব ভাবের মূর্তি গড়ে ওঠে। বাংলার কাব্য-সাহিত্যে এই মাতৃভাবের বিচিত্র রূপ ছড়ানো রয়েছে।

ব্রতের মা

বাংলার ব্রত বাঙালী মেয়েদের অনুষ্ঠান, বাঙালী মায়েদের অনুষ্ঠান। বাঙালী নারী ধন চায়, মনোমত পতি চায়, পুত্র চায়, চায় সৌভাগ্য। এই কামনা নিয়েই ব্রত। বঙ্গনারীর বিশ্বাস, ব্রতের ফলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

কেউ মনে করেন, এ কুসংস্কার। কেউ মনে করেন, এগুলি জাদুর নামান্তর। কোন ক্রিয়া করে অভীষ্ট লাভ করা যায়, এই বিশ্বাসকেই বলা হয় জাদু-বিশ্বাস। যেমন, কেউ কেউ ভাবেন, দারুণ খরার সময় কোন দেবস্থানে জল ঢাললে বৃষ্টি নামে। অনেক সময় বৃষ্টি নামেও। কামনার অনুরূপ ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার অনুরূপ ফল— এই-ই ব্রতের উদ্দেশ্য। মাঘমণ্ডল ব্রতে মেয়েরা মাটি বা পিটুলি দিয়ে আয়না, চিরুনী ও কটই গড়ে। কেন? তাঁরা বিশ্বাস করে—

আমরা পূজি মাটির আয়না।
আমাদের হবে সোনার গয়না॥
আমরা পূজি পিটুলির কটই।
আমাদের হবে সোনার কটই॥

বাংলার ব্রতগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—কুমারীব্রত ও বধূব্রত। প্রত্যেকটি ব্রতে মুখ্য মাতৃত্বের কামনা ও সন্তানের মঙ্গল। বাংলার নারী সন্তান-কাঙাল। বধূদের তো কথাই নাই, কুমারীর বুকেও সুপ্ত কুমারসম্ভবের কামনা, যেমন কুঁড়ির বুকে ফুলের স্বপ্ন। সেঁজুতি ব্রত, মাঘমণ্ডলের ব্রত, নাটাইচণ্ডীর ব্রত—এগুলি কুমারীব্রত। এই ব্রতগুলিতে বাপ-ভায়ের সংসারের মঙ্গল কামনা থাকলেও 'রাজার বৌ' হওয়ার সাধ ও পুত্র কামনার কথা গোপন থাকে

না। তোষ্‌লা বা পোষ্‌লা ব্রতে 'অব্বিয়াত' মেয়েরা প্রার্থনা করে—

দরবার আলো বেটা পাব।
সেঁজ আলো ঝি পাব ॥

বধূব্রতেই মাতৃত্বের কামনা বেশি স্পষ্ট। এদেশের হা-পুতিদের অন্তরে একটি গভীর বেদনা আছে। বাংলার শুভ অনুষ্ঠানে বন্ধ্যা নারী বর্জনীয়। স্ত্রী-আচারে এয়োকর্মে সন্তানবতী সীমন্তিনীকেই আহ্বান করা হয়। তাই—মেয়েরা মনে করেন, জলহীন নদী যেমন ব্যর্থ, যেমন ব্যর্থ নিষ্ফলা বৃক্ষ, তেমনই অভিশপ্ত সন্তানহীনা নারী। ধনরত্ন মিথ্যা, যদি না থাকে পুত্র বা কন্যারত্ন। নারীর পুনর্জন্ম সন্তান জন্মে। তাই ব্রতচারিণী বধূর প্রথম কামনা, 'অপুত্রবতী আছি, আমি যেন পুত্রবতী হই।'

সন্তান হলেই শুধু চলবে না, নারীকে হতে হবে জীবৎ-বৎসা। শিশুর অকালমৃত্যু এদেশের একটা বড় অভিশাপ। তাই নারীর কামনা—

হয়ে পুত্র মরবে না।
পৃথিবীতে ধরবে না ॥

কোলে একটি সন্তানের জন্য কাঙালপনা বঙ্গ-জননীর বিশেষত্ব। এই প্রচণ্ড ক্ষুধা তাঁকে ব্রতের দিকে আকর্ষণ করেছে। প্রায় প্রতিটি ব্রতকথার আরম্ভ আঁটকুঁড় পুরুষকে নিয়ে। পুরুষের এই অভিশাপ মোচনে নারীর দায় যেন সর্বাধিক। দেবতার পায়ে মাথা কোটা, তেত্রিশ কোটি দেবতার দুয়ারে ধন্না দেওয়া, পীরের দরগায় সিন্নি মানা ও অলৌকিক তুকতাক্ মন্ত্রে ও ঔষধে বিশ্বাস করা মাতৃত্বের অন্ধ আবেগের ক্রিয়া। তার জন্য কতবার পুত্র সরোবরে স্নান, কত উপবাস, কত না কষ্টকর সাধন। বাংলার অধিকাংশ ব্রতের জন্ম মাতৃত্ব লাভের আবেগে।

(বাংলার ব্রতচারিণী নারীর মূর্তি মহিমময়ী। তাঁর পবিত্রতার পরিমাপ করা যায় না। তিনি গৃহের কল্যাণী লক্ষ্মী—সংযত, ধীর, শান্ত। আশ্চর্য তাঁর দুঃখসহন ক্ষমতা, বিস্ময়কর তাঁর ত্যাগ। সন্তান-কামনা তাঁর কাছে হীন লালসার বহ্নিজ্বালা নয়। 'সন্তান সাধনার ধন', কঠোর তপস্যার প্রসাদ। সন্তানকে ঘিরে তাঁর বাৎসল্যের প্রকাশও শান্ত, সংযত, গম্ভীর। ব্রতের মা যেন মাটির বুকে প্রস্ফুটিত সূর্যমুখী। স্বর্গের আশীর্বাদ এনে তিনি সন্তানের মাথায় রাখেন। দুঃখের ব্রত জননীর, ব্রতের ফলভোগী সন্তান ও সংসার। ব্রতের জননী তাই ক্লিষ্টা অথচ কল্যাণী, দুঃখে খিন্না অথচ শুচিস্মিতা —যেন দগ্ধ প্রদীপের স্বর্ণশিখা।

ব্রতের তিনটি প্রধান অঙ্গ—ছড়া, আলপনা ও কথা। তিনটি অঙ্গে একই বাৎসল্যময়ী জননীর তিনটি রূপ। ব্রতের ছড়া যেন কামনা-ক্রিয়াময়ী মায়ের পূজার মন্ত্র! মা এখানে একই সঙ্গে পূজারিণী. ঋত্বিক ও পুরোহিত। স্নান, উপবাস, ফুল তোলা, ফুল ধরা—এইগুলি ব্রতের ক্রিয়া। ছড়া কাটতে কাটতে ব্রতচারিণী ক্রিয়ার সঙ্গে কামনার কথা প্রকাশ করেন যেমন অধ্বর্যুগণ যজুঃমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আয়োজন করেন যজ্ঞকর্মের। ছড়ার মধ্যেই বিগ্রহবতী হয়ে ওঠেন জননী তপশ্চারিণী।

ব্রতের দ্বিতীয় অঙ্গ আলপনা। আলপনার প্রকাশ পায় বাঙালী মায়ের শিল্পী মূর্তি। পিটালির গোলা দিয়ে নিকানো মাটির উপর যে শুভসূচক চিত্র আঁকা হয়, তাই আলপনা। আলপনা অন্তরস্থ কামনার চিত্ররূপ। এই আলপনায় প্রমূর্ত হয়—জোড়া ঘট, পূর্ণকুম্ভ শঙ্খলতা, চালতালতা, লক্ষ্মীর পাড়া ও ধানের ছড়া। এই চিত্রকর্মের উপকরণ অতি তুচ্ছ—চালের গুঁড়া ও জল। তুলি ডান হাতের কয়েকটি আঙুল। কিন্তু নিপুণ রেখাবিন্যাসের গুণে মাটির উপর শুভ্রবর্ণে সজীব হয়ে ওঠে গাছ, পাতা, লতা, পাখী, ঘট, ঘর, সূর্য, তারা—

আরও কত কি। 'কাজলরেখা' গীতিকায় দেখা যায়, কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিনে কাজলরেখা আল্পনা দিচ্ছেন। তার ভিতর আল্পনা দেওয়ার রীতি-পদ্ধতিসহ কঠিন চিত্রশিল্পের চাতুর্য পরিস্ফুট।

উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজাইয়া।
ধুইয়া মুছিয়া কন্যা লইল বাটিয়া॥
পিটালি করিয়া কন্যা প্রথমে আঁকিল।
বাপ আর মায়ের চরণ মনে গাঁথা ছিল।
জোড়া টাইল আঁকে কন্যা আর ধানছড়া।
মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা গৃহলক্ষ্মীর পাড়া॥

তারপর একে একে চিত্রিত হল, কৈলাসভবন, পদ্মপত্রে লক্ষ্মী-নারায়ণ, হংসরথে জয়া বিষহরী, সেওড়ার বনে বনদেবী ও ডরাই ডাকুনী প্রভৃতি। নদ-নদীও বাদ রইল না, 'গঙ্গা গোদাবরী আঁকে হিমালয় পর্বত', 'সমুদ্র সাগর আঁকে চাঁদ আর সুরুযে।' এ যেন পিটালির আঁকে দক্ষ পটুয়ার কীর্তি। শুধু চিত্র নয়, পিটালি দিয়ে কামনার অনুরূপ আয়না, চিরুনি ও কৌটাও গড়তে হয়। অর্থাৎ চিত্রকর্মের সঙ্গে ভাস্করের কাজও চলে। সর্বত্রই একটি নিপুণ শিল্পী-মনের অভিব্যক্তি। বাংলার মায়েরা 'কোলে পো কাঁখে পো' কামনা করেন। আল্পনায় আঁকা লতাটিও কোলে পো কাঁখে পো মায়ের আদল হয়ে দেখা দেয়। ব্রতের মায়ের এই শিল্পচেতনা বাংলার মাকে অন্য এক মর্যাদা দান করেছে। সন্তান তাঁর সাধ্য, ব্রত তাঁর সাধন। আর সেই সাধনার সঙ্গে যুক্ত আনন্দ ও সুন্দরের স্বপ্ন, যুক্ত শিল্পরুচি ও পবিত্র কল্যাণবোধ।

ব্রতের শেষ অঙ্গ ফলশ্রুতি বা ব্রতকথা শ্রবণ। ব্রতকথার প্রবক্তা জননী। ব্রতকথা কাদের রচনা জানা যায় না, কিন্তু কথা পরিবেশন করেন কোন মহিলা। এই কথা বলার মধ্যে বঙ্গ জননীর কথকতা-

শক্তির প্রকাশ। গল্প বলার এক অদ্ভুত কৌশল। শব্দগুলি বাঙালী জীবনের মর্মমূল থেকে সংগৃহীত, তাতে কোথাও থাকে অনুপ্রাস-যমকের অলঙ্কৃতি, কোথাও ছোট অথচ সংহত উপমা। মনে হয় গদ্য ছন্দেরও প্রথম জন্ম বাংলার ব্রতকথায়।

ব্রতকথার প্রচার্য দেবতার মহিমা, কিন্তু প্রচারক বঙ্গের জননী। কথাগুলির ভিতর বঙ্গ-জননীর দুস্তর তপোবল ও মমতা-বাৎসল্য প্রকাশ পায়। মা এখানে সঙ্কল্পে স্থির, প্রত্যয়ে অটল ও সত্যের প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠ। উদাহরণস্বরূপ ধরা যায়, অরণ্যষষ্ঠী বা আম ষষ্ঠীর ব্রত কথাটি—

ব্রাহ্মণ আঁটকুঁড়। সবাই ঘৃণা করে। গাঁয়ের নাপিতও তাঁকে খেউরি করতে চায় না। বামুনের বড় দুঃখ। সবচেয়ে দুঃখ বামনীর। তিনি বাঁজা বলে, কেউ তাঁকে এয়োকর্মে ডাকে না। বামনী কত দেবতার দুয়ারে ধন্না দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে একদিন তিনি মা ষষ্ঠীর নামে হত্যে দিলেন। মা কৃপা না করলে তিনি জীবন ত্যাগ করবেন। দেবী প্রসন্না হলেন। স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানালেন, বর্তীর (ব্রতীর) কোল আলো করা ছেলে হবে। কিন্তু কেউ সে ছেলেকে গালমন্দ করতে পারবে না। হাজার অন্যায় করলেও বলতে হবে, ষাট্ ষাট্। দেবী আরও বললেন, ব্রতের দিন ছেলে যেন মাথায় তেল না দেয়, যেন করমচা না খায়। এই শর্তের যে-কোন একটি ভঙ্গ হলেই তিনি ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। সন্তান-কাঙাল মা সেই শর্তেই রাজী হলেন। মায়ের কোল জুড়ে ফুটফুটে ছেলে হল।

কিন্তু ছেলে বড় দুরন্ত। যা না করা যায়, তাই করে। কিছু বলার উপায় নাই। সে পিসীর বেনারসী শাড়ি নষ্ট করে দেয়। পিসী সোহাগ করে বলেন, ষাট্ ষাট্। মা ষষ্ঠীর কৃপায় বেনারসীর বদলে ঢাকাই শাড়ি হবে। নাপিত চুল কাটতে আসে। ছেলে ক্ষুর দিয়ে নাপিতের কান কেটে দেয়। নাপিত তবু বলে,

ষাট্‌ ষাট্‌, মা ষষ্ঠীর কৃপায় সোনার কান হবে। মা তো মুখ দিয়ে কিছু বলতেই পারেন না। একে পুত্রস্নেহ, তার উপর মা ষষ্ঠীর বারণ।

সেদিন অরণ্যষষ্ঠী। মা ব্রতের আয়োজন করছেন। ছেলেকে ডেকে মাথায় দিব্যি দিয়ে বললেন, সোনা আমার, মানিক আমার, আজ করমচা খেয়ো না, মাথায় তেল দিও না। ছেলের জেদ চেপে গেল। করমচা খেতে হবে, মাথায় তেল মাখতে হবে। সে ছুটে চলল কলুবাড়ির দিকে। পথে আড়াবন ভেঙে করমচা পেড়ে খেল। কলুবাড়ি গিয়ে দেখল, তেল কোথাও নাই। উঠানে পড়ে আছে তেলের এক ভাঙা ভাণ্ড। সে সেই ভাঁড় নিংড়িয়ে তেল মাথায় দিল।

ওদিকে মায়ের বর্তে (ব্রতে) ষষ্ঠীর ঘট নড়ে উঠল। মা বুঝলেন, অকল্যাণ হবে। ছেলে বাড়ি ফিরতেই তিনি জিজ্ঞাসা করে জানলেন, ছেলে মানা মানেনি। মা ষষ্ঠী এবার বুকের ধনকে নিয়ে যাবেন। কোল খালি করে কোলের মানিক চলে যাবে। পেয়ে হারানোর সে কি বেদনা। তবু মা ধৈর্য হারালেন না। মা ষষ্ঠীর দোহাই দিয়ে তিনি নিজের হাতের সোনার কাঁকন খুলে ছেলের হাতে দিয়ে বললেন, তুই মা ষষ্ঠীকে এই কাঁকন দিয়ে বলিস, তিনি যেন শাঁখার আগে এই কাঁকন পরেন।

ছেলে তাই করল। মায়ের ঘর অন্ধকার করে সে গেল মা ষষ্ঠীর কাছে। বলল, মা বলেছে, তোমাকে শাঁখার আগে এই কাঁকন পরতে হবে। ষষ্ঠীদেবী তাই পরলেন। সাদা শাঁখার কোলে ভারী সুন্দর দেখাল সোনার কাঁকন। মা ষষ্ঠী এদিকে হাত ঘুরিয়ে দেখলেন, ওদিকে হাত ঘুরিয়ে দেখলেন। বাঃ কি সুন্দর দেখতে! হঠাৎ তাঁর মনে হল—

শাঁখার আগে সোনার কাঁকন।
মায়ের বুকে পুতের নাচন॥

কৃপাময়ী দেবীর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। মায়ের কোল খালি

করে ছেলেকে নিয়ে আসা ভাল হয়নি। তিনি আবার কাঁকনসুদ্ধ ছেলেকে ফিরিয়ে দিলেন মায়ের শূন্য কোলে।

দেবীর মহিমা প্রচারই এই কথার মূল লক্ষ্য। তবু 'শাঁখার আগে সোনার কাঁকন। মায়ের বুকে পুতের নাচন॥' —এই সংক্ষিপ্ত ছড়াটির ভিতর সন্তানকে ঘিরে মাতৃ-হৃদয়ের অগাধ তৃপ্তি, অসীম ভালবাসা ও অপার আনন্দের পবিত্র ভাবটি ফুটে উঠেছে। মায়ের সংযত ধৈর্য, ভক্তি, নিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তাও এই সঙ্গে লক্ষণীয়।

দেবতার কৃপায় অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার ঘটা সম্ভব, ব্রতের মায়েদের এই বিশ্বাস অটল। তাঁরা মানেন, দেবতার বরে দূরের বন্ধু উড়ে আসে, অসাধ্য সাধন হয়, মরা মানুষ পর্যন্ত প্রাণ পায়। এই দৈব নির্ভরতা ব্রতের মায়েদের যেমন ভক্তিনিষ্ঠ করে তুলেছে, তেমনই এনে দিয়েছে অসাধারণ মানসিক বল। মনে হতে পারে, দৈবনির্ভরতা মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে। কিন্তু ব্রতের মায়েরা নিরলসকর্মী। কর্তব্যে তাঁদের বিন্দুমাত্র ত্রুটি নাই। ত্যাগ ও সহনশীলতার তাঁরা একাদর্শ।

এমনই একটি ভক্তিমতী অথচ কর্মনিষ্ঠ মায়ের কাহিনী পাওয়া যায়, ভাদ্রের চাপড় ষষ্ঠীর ব্রতকথায়। এই ব্রতে পূজার পর মাকে কলার খোলায় পিঠালির চাপড় ভাসিয়ে দিতে হয়। ব্রতীকে ব্রত সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত উপবাসে থাকতে হয়। ষষ্ঠীর কৃপায় ছেলের কল্যাণ হয়, হারানো ধন ফিরে আসে, সকল মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এই ব্রত করেই এক গৃহস্থ-বৌ মনের মত ঘর পেয়েছিলেন, বর পেয়েছিলেন, কোলজুড়ানো ছেলে পেয়েছিলেন। দিন যায়। শ্বশুরের ইচ্ছা হল, তিনি পুকুর প্রতিষ্ঠা করাবেন। বধূর মনে আনন্দ ধরে না। দুহাতে দশ হাতের কাজ করতে লাগলেন। দেশজোড়া নেমন্তন্ন হল। রান্নার ভার নিলেন বধূ নিজে। কিন্তু উৎসবে বিঘ্ন দেখা দিল। শ্বশুরের দশ-দশটা পুকুর। সব পুকুরে জাল ফেলে

একটি পুঁটি মাছও পাওয়া গেল না। খবর গেল রান্নাঘরে। মা ষষ্ঠীর নাম নিয়ে বধূ বললেন, এঁদো পুকুরে জাল ফেলা হোক। অবাক কাণ্ড! যে পুকুর হাজা-বোজা, সেই পুকুরে জাল ফেলতে বড় বড় রুই কাত্‌লা ধরা পড়ল। মা ষষ্ঠীর দোহাই দিয়ে বৌ রান্না চড়ালেন। ওদিকে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল। যে পুকুর প্রতিষ্ঠা করা হবে, তাতে জল ওঠে না। হাজার কামুলা মাটি কেটে হয়রান। গণক এসে কর্তার কানে কানে বললেন, নাতিকে কেটে পুকুরে রক্ত দিলে জল উঠবে। কর্তা ঘরে দরজা দিলেন। ছেলের কানেও কথাটা গেল। ছেলে বলল, তাই হবে, তবে কথাটা বৌয়ের কানে না যায়। চুপে চুপে ছেলে কেটে রক্ত দেওয়া হল। দেখতে দেখতে শুকনো পুকুরে অথৈ জল। পুকুর প্রতিষ্ঠা হল। হাজার পাত পড়ল। সকলে খেয়ে পরম পরিতুষ্ট। বধূর হাতের রান্না যেন অমৃত। এদিকে রান্নাঘরের পাট মিটিয়ে বৌ যখন বাইরে এলেন, তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। সারাদিনের পরিশ্রম, রান্নার কালিঝুলি। একটি কলার খোলে খানিকটা বেসন (পিঠালি) নিয়ে দাসীর সঙ্গে বৌ চললেন নতুন পুকুরে স্নান করতে। জলে নেমেই মনে হল, আজ ষষ্ঠী। ব্রত তো হয়নি। ভাগ্যিস খাওয়া হয়নি। তখনই তিনি মা ষষ্ঠীর নাম নিলেন। ছয় গাছ দূর্বা সংগ্রহ করে গায়ে মাখা বেসন দিয়ে চাপড় বানিয়ে কলার খোলে নতুন জলে ভাসিয়ে দিলেন। কামনা করলেন শ্বশুরের মঙ্গল, স্বামীর মঙ্গল। শেষে ছেলের মঙ্গল কামনা করে বললেন—

'চাপড় যাক ভেসে। ছেলে আসুক হেসে ॥'

হঠাৎ কি হল, কে যেন জলের ভিতর মায়ের পা জড়িয়ে ধরল। তুলে দেখলেন, তারই ছেলে খিল্‌খিল্‌ করে হাসছে। ষাট্‌ ষাট্‌ করে তিনি পরম সোহাগে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ঘরে ফিরলেন। শ্বশুর

স্বামীকে ডেকে অনুযোগ করে বললেন, সারাদিন রান্না ঘরে আছি, ছেলে কখন জলে পড়েছে কেউ দেখেনি? শ্বশুর ও সোয়ামী তো অবাক। তাঁরা জানেন, ছেলে কেটে রক্ত দেওয়া হয়েছে পুকুরে। কথা চাপা থাকল না। ধন্য ধন্য রব উঠল বধুর নামে, মা ষষ্ঠীর নামে।

নিরাকুল নারায়ণ ব্রতকথায় দেখা যায়, দেবতার বরে রাণী আঁটকুড় রাজার অভিশাপ মোচন করে 'কোলে পো' পেয়েছিলেন। আবার স্বামীর দোষে দেবতার রোষে রাজ্য হারিয়েছেন, স্বামী হারিয়েছেন। গভীর বনে অসহায় সন্তানদের রেখে, জল খেতে গিয়ে সওদাগরের নৌকায় বন্দী হয়েছেন। তবু তিনি ধৈর্য হারাননি। বিপদের দিনে ব্রতের দেবতার উপর বিশ্বাস রেখে ছেলেদের রক্ষা প্রার্থনা করেছেন, পর পুরুষের নৌকায় বাস করতে হবে বলে তিনি দিনের দিবাকর নারায়ণের কাছে নিজ অঙ্গে কুড়িকুষ্ঠ চেয়ে নিয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দেবতার বরে দুঃখনিশার অবসান হবেই। হয়েও ছিল তাই। বারো বছর পরে সওদাগরের নৌকা এক রাজার ঘাটে এসে নোঙ্গর করতেই তিনি দেখলেন, ফুটফুটে দুটি ছেলে ঘেটেলের কাজ করছে। দেখেই রানীর বুকে স্নেহ উথলে উঠল। ছেলে দুটি গয়লার ছেলে বলে পরিচিত। কিন্তু বড়র মুখ থেকে তিনি শুনলেন, তাঁরা ছিল রাজপুত্র। বড়র যখন বয়স ছয় বছর, তখন রাজ্য হারিয়ে তাঁরা বনে এসেছিল। সেই বনেই ছোট ভায়ের জন্ম। গল্পছলে বড় ভাই বলতে লাগল—

বাপ্ গেলেন জল আনতে আর ফিরলেন না।
মা গেলেন জল খেতে আর এলেন না॥
যে গুণে ছিল গোয়ালের কপিলেশ্বরী গাই।
সেই গুণে বাঁচলাম আমরা দুটি ভাই॥

রানী মিলিয়ে দেখলেন, এ ছেলে দুটি তাঁর। তিনি রাজসভায় বিচার প্রার্থী হলেন। গয়লা দাবী করল, ছেলে তার। বিচারে সাব্যস্ত হল, দীঘির দুই তীরে দাঁড়াবে কুন্নী ও গয়লানী। মাঝখানে থাকবে দুটি ছেলে। যার স্তনের ধারা ছেলেদের মুখে এসে পড়বে, তিনিই আসল মা। কিন্তু গয়লানীর বুকে দুধ আসবে কি করে? সে তো বাঁঝা। কুন্নী হলেন মা। তাঁর স্নেহ কোটালের বান। ধর্মের নাম করে স্তনে হাত দিতেই বত্রিশ নালে ধারা বেয়ে দুগ্ধধারা দুই ছেলের মুখে এসে পড়ল। ছেলেরা মা মা বলতে বলতে কুন্নীর কাঁখে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রানী ব্রতের ফলে ছেলে পেলেন, সোয়ামীও পেলেন। বিচারের রাজাই তাঁর স্বামী। নারায়ণকে ডেকে কুন্নী তাঁর পূর্বরূপ ফিরে পেতেই রাজাও তাঁকে চিনতে পারলেন। দেবতার বরে অস্মরণ রাজার স্মরণ হল। মহা আনন্দে তিনি রানী ও রাজপুত্রদের নিয়ে পুরীতে ঢুকলেন।

অটল ভক্তি বিশ্বাসের এই ভাব যে শুধু হিন্দুর, তা নয়। বাঙালী মুসলমান মায়েরাও এর ব্যতিক্রম নন। বাঙালী মুসলমানেরা জানেন, 'হেঁদু আর মুছলমান একই পিণ্ডের দড়ি।' একই ভগবানকে কেউ বলেন 'হরি' কেউ বলেন, 'আল্লা রছুল।' তা ছাড়া মায়েদের তো কোন জাত নাই, বর্ণভেদও নাই। মাতৃস্নেহ সর্বত্র সমান। সন্তানকামনায় বা মঙ্গল কামনায় হিন্দু মায়েরা যেমন ষষ্ঠী বনদুর্গার পূজা করেন, মুসলমান মায়েরাও তেমনই মসজিদে বা পীরের দরগায় সিন্নি মানেন। হিন্দুর যেমন তেত্রিশ কোটি দেবতা, মুসলমানেরও তেমনই 'নয় লক্ষ পেগাম্বর', 'আশি হাজার পীর', আর অসংখ্য ফকির, গাজী, দরবেশ। এছাড়া আছেন সত্যপীর, বনবিবি, দক্ষিণরায় ও সোনা রায়। এঁরা হিন্দুরও মান্য।

পীর-ফকিরের দোয়া মানত করে সন্তান লাভ করলেও বাংলা-সাহিত্যে মুসলমান ব্রতচারিণী মায়েদের চিত্র তেমন নাই। বনবিবির

কাহিনীতে বনবিবির মহিমা প্রকাশ পেয়েছে হিন্দুর দুঃখিনী মা 'দুখের মা'র প্রার্থনায়। উত্তর-পূর্ববঙ্গের সোনা রায়ের কাহিনীতেও হিন্দু মায়ের চিত্র। তিনি ছিলেন পীরের ভক্ত। পীরের দোয়ায় তিনি পুত্রলাভ করেন 'পীরের বরে জন্ম লৈল পুন্নমাসীর চান।' ইনিই বহুখ্যাত সোনা রায়।

বাংলা সাহিত্যে হিন্দুজননীর ব্রতের মূর্তিই উজ্জ্বলতর। 'বাঙালী মায়ের দুঃখ, দুঃখের তপস্যা ও বিপদে বিজয়িনীর মহিমায় সে চিত্রগুলি মনোরম। ব্রতের জননী বঙ্গের সুমঙ্গলী গৃহলক্ষ্মীর পবিত্র প্রতিমা।'

ছেলেভুলানো ছড়ায় মা

এদেশের সাহিত্যে মাতৃ-মূর্তির ক্রম-বিকাশের একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। উষা ও প্রভাত যেমন একই প্রাতঃসন্ধ্যার দুই রূপ, তেমনই একই মায়ের দুটি রূপ ফুটে উঠেছে বাংলার ব্রতে ও ছেলে-ভুলানো ছড়ায়। ব্রতে সন্তানকামনায় উন্মুখ মায়ের ব্রতচারিণী মূর্তি। এ যেন সূর্যোদয়ের পূর্বে শুভ্রজ্যোতি পূর্বাশার তপস্যা। এই তপস্যার ফলে ক্রমে অরুণ আভা জাগে, বাল সূর্য উদিত হয়। তখন আলোয় উদ্ভাসিত কলকাকলিতে মুখরিত প্রভাত। এইটেই ছড়ার জননী মূর্তি।

ব্রতকথায় সন্তানবতী মায়ের কথাও আছে। সে মায়ের প্রধান লক্ষ্য দেবতার তুষ্টি। কিন্তু ছড়ার মায়ের সমগ্র লক্ষ্য ও চেষ্টা সন্তানের মনস্তুষ্টি। তাঁর স্তুতি অলক্ষ্য দেবতার উদ্দেশ্যে নয়, প্রত্যক্ষ নবজাতকের উদ্দেশ্যে।

ছড়ায় মাতৃত্বের প্রকাশ ছন্দে, গানে ও কথায়। ছড়ার মা ছন্দের রানী, সুরের সম্রাজ্ঞী। আনন্দ ও সোহাগ এখানে ছন্দে ও সুরে সুরেলা। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যখন পরিতৃপ্ত হয়, তখন আর সে মনের আনন্দকে ধরে রাখতে পারে না। শুদ্ধ গদ্যেও তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ, গদ্য প্রয়োজনের ভাষা। প্রকাশ করা মাত্রই তার সামর্থ্য শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সিদ্ধকাম জননী যা প্রকাশ করতে চান, তাকে তো ফুরিয়ে গেলে চলবে না। গভীর আবেগকে তিনি দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চান। ছন্দোময় কবিতা আর সুরময় গান অন্তহীন ভাবের বাহন। তাই মায়ের সোহাগ ছন্দে ও সুরে ঝঙ্কারমুখর হয়ে ওঠে।

শিশুকে ভুলানোর জন্যই ছন্দ ও সুরের যত আয়োজন। কারণ, ধরার মায়ের বুকে যে শিশুর আবির্ভাব, সে নিরীহ শান্ত শিশু নয়। সে যেন আমাদের পুরাণের নীললোহিত কুমার রুদ্র। রোদনেই তার আত্মপ্রকাশ, রোদনেই তার আত্মপ্রচার। তুষ্টির সামান্য ত্রুটিতে ভয়ঙ্কর রুষ্টি। এই রোষের ভাষা শিশুর কান্না। এই কান্না থামাতে মাকে হিমসিম খেতে হয়। শিশুরা প্রধানত ভোলে বিচিত্র ধ্বনিতে। অনেক সময় দেখা যায়, কান্নায় ভেঙে পড়া শিশু শান্ত হচ্ছে ঝিনুক-বাটির টুং টাং শব্দে বা ঝুমঝুমির বাজনায়। ছড়ার মা এই শব্দ সৃষ্টি করেন মুখে। শিশুকে বুকে নিয়ে, হাতের দোলায় বা হাঁটুর উপর শিশুকে শুইয়ে মুখ দিয়েই 'ও-ও' বলে বিচিত্র ধ্বনি সৃষ্টি করেন। ধ্বনির মোহ জাগে গুঞ্জরণে ও ধ্বনিগুচ্ছের নিয়মিত সঞ্চরণে। তার ফলেই আসে সুর, আসে ছন্দ। মনের সোহাগ মিশিয়ে মায়েরা সুর ও ছন্দের এই যে যাদু রচনা করেন, তাই ছড়া—শিশুদের ভুলন-কাঠি। এতে থাকে ধ্বন্যাত্মক কত শব্দ, কত অনুপ্রাসের ঝঙ্কার আর দ্রুতলয়ের বিন্যাস। সেই সঙ্গে স্বরাঘাতের বিচিত্র প্রযত্ন। ছড়ার মা শব্দের যাদুকরী, ধ্বনি, সুর ও ছন্দসরস্বতীর বর-কন্যা।

ছড়ার আর এক উপকরণ কথা। এই কথা নিয়েই যত তর্ক-বিতর্ক। কারণ, ছড়ার কথায় অর্থসঙ্গতির একান্ত অভাব। এক একটি পংক্তির হয়তো অর্থ আছে, কিন্তু সমগ্রটা মিলে কোন অখণ্ড ভাব, ঘটনা বা গল্প দানা বাঁধে না। মনে হয়, এ কোন পাগলের প্রলাপোক্তি। প্রাচীন সাহিত্যে ছেলেভুলানো ছড়াকে বলা হয়েছে 'উল্লাপন'। উল্লাপন শব্দটির অভিধানগত অর্থ, বিকারগ্রস্ত রোগীর অর্থহীন প্রলাপ। তাহলে ছড়ার মা কি প্রলাপিনী?

রবীন্দ্রনাথ শিশুমনের নিয়ত পরিবর্তনশীলতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে ছড়ার ভাবানুসঙ্গবিহীন অসংবদ্ধ কথার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শিশু চঞ্চল, বৃহৎ পূর্ণাঙ্গ ভাবকে সে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে

পারে না ; 'বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ—তাই সুসংলগ্ন কার্যকারণ সূত্র' ধরে অগ্রসর হওয়াও তার পক্ষে দুঃসাধ্য। কাজেই ছড়ার ভাব ও কথাও অসংলগ্ন।

তিনি আরও বলেন, শিশুর মনে সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখাও সুদৃঢ় নয়। সে যে-কোন ব্যাপারকে বিশ্বাস করতে দ্বিধা করে না। তাই ছড়াতেও সম্ভব-অসম্ভবের সীমা ভেঙে একাকার। কিন্তু মনে হয়, ছড়ার ভাবসঙ্গতির অন্য কারণও আছে। সাধারণত বাঙালী মায়ের মূর্তি দুঃখিনী মূর্তি। কিন্তু ছড়ার মাতৃমূর্তি কৌতুকময়ী ও হাস্যোজ্জ্বল। মা এখানে পূর্ণকাম ও পরিতৃপ্ত। বুক জুড়ানো ধনকে নিয়ে তিনি উল্লসিত, উচ্ছলিত ও ধন্য। পরিতৃপ্ত জননীর এই হাসিভরা মুখখানি ছড়া-দর্পণে প্রতিবিম্বিত। কৌতুকাশ্রিত বাৎসল্যই ছড়ার মুখ্য রস। ছড়ার পরতে পরতে কৌতুক-হাস্যের ছড়াছড়ি। হাস্য-কৌতুকের প্রধান উপাদান অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতা। বিকৃত বাক্য, অসংবদ্ধ প্রলাপ ও অসঙ্গত ঘটনা—এইগুলিই হাস্যরসকে পুষ্ট করে। ছড়ার অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক কল্পনা এই কৌতুক রসের পরি-পোষক। পূর্ণকাম পরিতৃপ্ত জননী এখানে রঙ্গময়ী। ছড়ার কথাও তাই রঙ্গভরা।

ছড়াগুলিকে দোলন-গীতি, নাচন-গীতি, ভোজন-গীতি প্রভৃতি নানা-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি ভাগেই রঙ্গময়ী মায়ের কৌতুক উপছে পড়ে। বাল্যের অশান্ত শিশুর সব ঝামেলা মাকেই পোয়াতে হয়। তাতে মাকে বিরক্ত হলে চলে না। তাই তাঁকে ফাঁদতে হয় রঙ্গকথার জাল। আর সেই কথার জালে ধরা পড়ে সত্য-মিথ্যা, সম্ভব-অসম্ভব যত চিত্র ও ঘটনা। এই ভাবেই ঘুমপাড়ানী গানে প্রাণহীন ঘুম জীবন্ত হয়ে ওঠে। ঘুমকে বাগ্‌দি পাড়া দিয়ে ঘুরে আসতে হয়। ঘুমের মাসি-পিসিও ঘুম নিয়ে আসেন। তাদের দেওয়া হয় বাটাভরা পান, মাছের মুড়ো আর নারেঙ্গা ধানের খই।

রঙ্গময়ী মা ঘরে বসেই খোকা-খুকুর জন্য ঘরে ছোটেন ননী খুঁজতে, বাগানে ছোটেন ফুল আনতে, স্যাকরার বাড়ি ছোটেন গয়না গড়াতে, আকাশে ছোটেন গগনফুল কুড়াতে। এমনই করে আরও কত কৌতুককর ব্যাপার ঘটে। ভালুকে তেঁতুল খায়, চামচিকে বাজনা বাজায়, পুঁই শাক কেঁদে মরে, পানকৌড়ি বেগুন কোটে, পুঁটির শ্বশুর-বাড়ি যাত্রাকালে সঙ্গে যাবার জন্য কুনো বেড়াল কোমর বাঁধে। এই সবই রঙ্গ রসের বিষয়। ছড়ার মা জানেন, অসঙ্গতি না থাকলে হাসি জমে না। তাই ইচ্ছা করেই তিনি রাজ্যের অসম্ভব ও অস্বাভাবিক চিত্র জড়ো করে ছড়ার ভিতর ছড়িয়ে দেন। ছড়ার গান—সে ভোজন গীতিই হোক, আর নাচনগীতিই হোক, কৌতুকরঙ্গের রঙ্‌মহল। এইগুলি পরিতৃপ্ত মায়ের হাস্যভরা হৃদয়ের দীপ্তি ও আনন্দের লহর।

নানাভাবে মা এই কৌতুক সৃষ্টি করে থাকেন। খোকাখুকুর ভিতর কখনও মা আবিষ্কার করেন ভাবী বরবধূর রূপ। কারণ, খোকাখুকুই মায়েদের ভবিষ্যৎ-জীবনের কামনার কুঁড়ি, আশার মুকুল। 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা পাপড়ি পাতার বন্ধনে'—এ সত্যটি মায়ের চেয়ে কে বেশী বোঝে? তাই খোকার বিয়ের ব্যাপারে কত না রঙ্গ। রাজার মেয়ের সঙ্গে খোকার বিয়ে। তাতে বর-যাত্রার কত ঘটা। রাজ্যের জন্তু-জানোয়ার বরযাত্রীদের শোভা বর্ধন করে। বাদ্যে-ভাণ্ডে, উলুউলু শব্দে সে এক বিপুল সমারোহ। বধূর চিত্রে তো ভাব-রঙ্গের একশেষ—

'বধূর পান খেয়ো না ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে উঠেছে॥'

অনেকেই মনে করেন, ছেলেভুলানো ছড়াগুলি স্নেহোচ্ছল জননী-দেরই রচনা। তাই যদি হয়, তবে ব্রতে যেমন পাওয়া যায় শিল্পী বঙ্গজননীর পরিচয়, তেমনই ছড়ায় পাওয়া যায় স্নেহবৎসল জননীর কবি মূর্তি। ছড়ায় মাতৃত্বের প্রকাশ কবিত্বে।

কবিমনের প্রধান অবলম্বন কল্পনা। যাঁর কল্পনা যত দিগন্ত বিস্তৃত, তিনি তত বড় কবি। ছড়ায় দেখা যায়, এই কল্পনার সীমাহীন বিস্তার। মাটি থেকে তা আকাশে সঞ্চরণ করে। মাটির নদী, নৌকা, বোয়ালমাছ, কোলাব্যাঙ, ভোঁদড়, বাঁদর কিছুই বাদ যায় না। বাদ যায় না ডালিম গাছ, কল্‌মিলতা, পদ্মফুল ও তুচ্ছ নটে গাছ। আকাশের বুকেও সে কল্পনার অবাধ বিহার। আকাশের চাঁদ ও সূয্যি খোকাখুকুর মামা হয়ে মধুর সম্পর্কে ধরা দেয়। তাতে সম্ভব-অসম্ভবের সীমা লঙ্ঘিত হয় বটে, কিন্তু মায়ের মনে শিশুর জন্য যে বিপুল জগতের আসন পাতা আছে, তা অবারিত হয়।

শুধু তাই নয়, কবিধাত্রী বঙ্গজননী ছড়ার ভিতর দিয়ে, বঙ্গ-প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্যের সঙ্গে শিশুর একটি সম্পর্ক পাতিয়ে দেন। বাংলার নদনদী, কোটালের বান, দীঘি, পদ্মবন, আকাশের মেঘ, দুপুরের রোদ কবি-জননীর এক একটি শব্দরেখায় মূর্ত হয়ে ওঠে। কখনও বা প্রমূর্ত হয় টলমল নদীর জল, বালি ঝুরঝুর নদীর তীর—

এ নদীর জলটুকু টল্‌মল্ করে।
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুরঝুর করে॥

কখনো বা চোখের সামনে ভেসে ওঠে এপার-ওপার নদীর মাঝে চরের পট—

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
মধ্যি খানে চর।

কখনও বা সূর্যাস্তের মেঘে ছাওয়া সন্ধ্যার রূপ—

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
সূয্যি গেছে পাটে।

মায়ের আঁকা শব্দচিত্রে সবচেয়ে জীবন্ত বর্ষা ঋতুর চিত্র। মেঘ,

দিনের আব্‌ছা অন্ধকার, টাপুর টুপুর বা ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি ও বানে ভরা নদী—সব মিলিয়ে বর্ষার পরিপূর্ণ ছবি। কত অল্প কথায়, কত স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করা যায়, ছড়ার এক একটি পংক্তি তার দৃষ্টান্ত। যেমন একটিমাত্র বাক্যে বৃষ্টি ও ভরা নদীর এই অপূর্ব ছবি—

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।

আর একটি সজীব ছবি এই পংক্তিটি—'ও পারেতে কালো রঙ্, বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্।' ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টিতে দিনের আলোর উপর যবনিকা নেমেছে। অন্ধকারের মত কালো দেখাচ্ছে ওপারের দৃশ্য।

স্বল্পাক্ষরা বাণীতে এ যেন মহাকবির হাতের চিত্রলিপি।

কবি-প্রতিভার আর এক পরিচয় কবিতার অঙ্গে রসানুকুল অলঙ্কার যোজনা। মা অবশ্য সহজভাবেই সহজ কথা বলেন। তবু ছড়ায় অলঙ্করণের অভাব নাই। উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তিতে ভরা ছড়া। এই অলঙ্কারগুলি জোর করে যোজনা করা হয় নাই। রসাভিব্যক্তির এক প্রযত্নেই তারা সিদ্ধ। বাৎসল্য রসের উদ্বোধনে তাদেব সার্থকতা। সোহাগের ধন খোকা-খুকুকে কেমন করে মা অন্যের চোখে তুলে ধরবেন? দৃষ্টির গোচরে আছে জলের পদ্ম। আর আকাশের চাঁদ। তাই পদ্মের সঙ্গে বা চাঁদের সঙ্গে মুখের উপমা। চাঁদের সঙ্গে তুলনাই বেশি। চাঁদ আবার মুখের সঙ্গে একাকার হয়ে রূপক হয়েছে 'চাঁদমুখ'; কোথাও আবার উপমেয় মুখ ঢেকেই গিয়েছে, আছে শুধু 'ঘরের চাঁদ'। কিন্তু মায়ের আদরের ধনের কাছে চাঁদও যে তুচ্ছ। তাই চাঁদের অপকর্ষ ও খোকার উৎকর্ষ ঘোষণা করে এল ব্যতিরেকে অলঙ্কার—

তোর মত চাঁদ কোথায় পাব,
তুই চাঁদের শিরোমণি।

কবি বিদ্যাপতি রাধার মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, 'শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষের বা। বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।'—অর্থাৎ কৃষ্ণময়ী রাধার পক্ষে কৃষ্ণ হলেন শীতকালের চাদর, গ্রীষ্মের বায়ু, বর্ষার ছাতা ও নদীর আশ্রয় নৌকা। প্রাণের ধন কৃষ্ণকে রূপকের মালায় সাজিয়েছেন কৃষ্ণৈকপ্রাণা রাধা। সন্তান-সর্বস্ব বাঙালী জননীও তেমনই রূপকের মালায় মণ্ডিত করেছেন তার প্রাণের ধন সন্তানকে—

ধন ধন ধনা।
চোত বোশেখের বেনা॥
ধন বর্ষাকালের ছাতা।
জারকালের কাঁথা॥

কে কার কাছে ঋণী? জননী কি ঋণ নিয়েছেন রাজসভার কবির কাছে? না, রাজসভার কবিই অধমর্ণ হয়েছেন স্নেহময়ী জননীর দ্বারে?

কবিতার উৎকর্ষ রসের স্ফূর্তিতে। ছড়ার মুখ্য রস বাৎসল্য—মিলন বাৎসল্য। এর বিষয়বিভাব সন্তান, আশ্রয়বিভাব মাতৃহৃদয়। সন্তানকে কেন্দ্র করে মাতৃহৃদয়ের স্নেহপূর্ণ ভাবটিই বাৎসল্যের স্থায়ী ভাব। প্রতিটি ছড়া এই স্নেহভাব দিয়ে গড়া। ছড়া পরিতৃপ্ত মাতৃত্বের উল্লাস, যেন চন্দ্রোদয়ে স্ফীত তটিনীর কলোচ্ছ্বাস। ছড়ার মা একান্তভাবে সন্তানময়ী। সন্তান শুধু অঙ্গ নয়, অঙ্গী—'ধন পরাণের পেটে?' এ ধন না থাকলে জীবন বৃথা—'এমন ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন।' এ ধন নিয়ে নির্জন বনবাসেও সুখ। নাই বা থাকলো সে বনে মুখের আহার। সঙ্গে আছে সোনার চাঁদ। আর কে না জানে, চাঁদ হল সুধার আকর। তৃষ্ণার্ত চোখ দিয়ে এই চাঁদের সুধা পান করেই মায়ের দিন কাটবে—

ধনকে নিয়ে বনকে যাব,
সেখানে খাব কী।
নিরলে বসিয়া চাঁদের
মুখ নিরখি।

সন্তান-স্নেহের এমন আত্মলুপ্ত ছবি আর কোথায় আছে ?

ছড়ার মা একান্তভাবে সন্তানময়ী। স্নেহের শক্ত বাঁধনে হৃদয়-তন্ত্রীর সঙ্গে গাথা সন্তান। তাই স্নেহের সবখানি উজাড় করে দিয়েও আশা মেটে না। ছেলে একটু কেঁদে উঠলে মা পাগল হয়ে উঠেন। কেন খোকা কাঁদে ? কি ধন সে চায় ? সে ধন সংগ্রহ করতে মাকে যদি দুর্গম স্থানেও যেতে হয়, মা তাতেও রাজী।

ছড়ার নাচন-গীতিগুলির ভিতর মাতৃস্নেহের আর এক দিকের প্রকাশ। খোকাখুকু বড় হয়, ক্রমে হামাগুড়ি দেয়, ক্রমে পা ফেলতে শেখে। সন্তানের নাচনে মায়ের স্নেহের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরে আনন্দের শিহরণ জাগে। সে এক গভীর আত্মপ্রসাদ। প্রসন্ন মাতৃহৃদয়ের আনন্দ-নৃত্যেই শিশু-নৃত্যের উদ্বোধন। মায়ের বুকখানিই এ নাচনার প্রথম আসর—'খোকা নাচে বুকের মাঝে।' তারপর নাচনা চলে মাটির বুকে, মায়ের কল্পনায় 'শতদলের মাঝখানে।' এ নাচন কি সহজে আসে ? এ নাচন কিনে আনতে হয়। রুষ্ট শিশুর কাটাপানা মুখে ও নাটাপানা চোখেও নাচনার নেশা।

ছড়ার নাচনগীতিতে বিনোদন-বিলাসিনী জননীর আনন্দ উপছে পড়ে। সে নাচন দেখে মায়ের সুখের সীমা থাকে না। দশজনকে ডেকে সে নাচন দেখিয়ে জননী গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। মায়ের স্নেহ এখানে মর্ত্যের আঙিনায় স্বর্গ রচনা করে।

প্রত্যেকটি ছড়ায় মাতৃস্নেহের প্রকাশ রঙে, কৌতুকে, উল্লাসে। মায়ের ব্যাকুলতার মধ্যেও কৌতুক। সন্তানের সামান্য কষ্টেও মা

ব্যাকুল। মেয়ে পদ্মদীঘিতে জল আনতে গেছে। সূর্য পাটে বসল, আকাশ জুড়ে মেঘ করে এল। মায়ের ভয়, খুকুর গোছাভরা চুল ভিজে যায়। তাই মায়ের মানা—

বিষ্টি এলে ভিজবে সোনা
চুল শুখানো ভার।
জল আনতে খুকুমণি
যায় না যেন আর॥

এখানে সুকেশী মেয়ের রূপ বর্ণনায় মাতৃস্নেহের গর্বোল্লসিত ভাবটি ফুটে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে কল্পিত উদ্বেগের মিশ্রণে বাৎসল্যের প্রকাশ বিচিত্র হয়ে উঠেছে।

খোকার মাছ ধরার অভিযানেও মায়ের আদর-সোহাগের অভিব্যক্তি। খোকা ছেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে চলেছে। হেঁটেই যাচ্ছিল। কিন্তু পায়ে মাছের কাঁটা ফোটে। তাই সঙ্গে সঙ্গে দোলার ব্যবস্থা। দোলা নদীর তীরে উপস্থিত হতেই আর এক চিন্তা। খোকার চাঁদের মত স্নিগ্ধ মুখ, প্রখর রৌদ্রের ঝলকে লাল হয়ে উঠেছে। অমনই মায়ের সোহাগভরা সংবেদন রূপকে-উৎপ্রেক্ষায় মুখর হয়ে উঠল—

চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে
রক্ত ফুটে পড়ে।

খুকুর জল আনতে যাওয়াও কল্পনা, খোকার মাছ ধরতে যাওয়াও কল্পনা; সেই কল্পনার রাজ্যেই কৌতুকময়ী মায়ের আশঙ্কা-উদ্বেগ ও চিন্তারঞ্জিত বাৎসল্য সহস্রধারার উৎসারিত।

ছড়ার ভাষাও ভাবের ভাষা, মমতা মাখানো ভাষা। এ ভাষার প্রধান গুণ কোমলতা। মায়ের স্নেহ দিয়ে গড়া বলেই এ ভাষা স্নিগ্ধ মমত্বে পূর্ণ। নবনীকোমল শিশুর মতই এ ভাষা কান্ত কোমল। তা

যেন কোন গুরুভার সহ্য করতে পারে না। খুদে শিশুর জন্য ভাষার খুদে রূপ (Dimunitive Form) সঙ্কলনেও স্নেহময়ী জননী সিদ্ধহস্ত।

ছড়ার মা সন্তানসুখে সুখী, গরবিনী মায়ের নিটোল ছবি। এ যেন পুষ্পোল্লাসিত বসন্তের বনশোভা। বাৎসল্য এখানে কৌতুকে, কবিত্বে, হাস্যে ও উদ্ভট কল্পনার উল্লাপনে স্বাদু ও হৃদয়গ্রাহী।

রূপকথায় মা

বাংলার রূপকথা যেন রূপালি স্বপন। সোনারূপার 'রূপা' নয়, রূপকের রূপা দিয়ে এই স্বপ্নময় কথাগুলি তৈরী। রূপকথা 'রূপ-সাগরের জলে সোনার নালে সহস্রদল পদ্ম।' এই রূপকমল দেখে কিশোরের চোখে তেপান্তরের মাঠ আর সাত-সাগরের স্বপন ভাসে, বাঙালী মায়ের বুকে বত্রিশ নালে স্নেহের ধারা উথলে ওঠে।

রূপকথার জন্ম দাই মাসী, মালিনী বা বর্ষীয়সী কোন মহিলার মুখে। কখনও পল্লী-কবির কণ্ঠেও গ্রাম্য গদ্যে ও গানে রূপকথা মুখর হয়। সন্তান জন্মের ছয় ষষ্ঠীর নিশুত রাতে বিধাতা পুরুষ শিশুর কপালে ভাগ্যের লিখন লিখে যান। এই রাতে আঁতুড়ে ছয়টি প্রদীপ জ্বালিয়ে মাকে সারারাত জেগে থাকতে হয়। 'জাগরণ' কথার আকারে তখন তাঁকে শোনাতে হয়, 'অমুক রাজ্য সমুক রাজা' বা 'অমুক কুমারী সমুক কুমারীর গল্প'। এইগুলিই রূপকথা।

কিন্তু এই রূপকথা শুধু আঁতুড়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। সন্ধ্যার পরিবেশে ঠাকুরমা ঠানদিদিকেও কিশোর-কিশোরীদের কাছে রূপকথা বলতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে বৃদ্ধা ব্রহ্মঠাকুরানীর নিকুঞ্জ ছিল এমনই এক রূপকথার আসর। সেখানে নববধূরাও রূপকথা শোনার বায়না নিয়ে উপস্থিত হতেন।

রূপকথা বাংলার ছেলেমেয়েদের রোমাঞ্চকর অভিযান, প্রেম ও ত্যাগের কাহিনী। বঙ্গ নারীর প্রেমের স্বপ্ন ও অদ্ভুত আত্মত্যাগের মহিমায় কথাগুলি পূর্ণ। অনেক কাঞ্চনমালা, কাজলরেখা ও সন্নমালার সতীতেজ ও দুঃখের ব্রতে রূপকথা উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে আবার স্বপ্নের ভাষায় কীর্তিত বাংলার ছেলেদের দুঃসাহসিক বীরত্বের

কাহিনী। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এদেশের ছেলেরা মেঘলোকের দিকে যাত্রা করে, কখনও ময়ূরপঙ্খী নাও নিয়ে ভাসে পাতালপুরীর দিকে। রাক্ষস-খোক্কসদের নিঃশেষে ধ্বংস করে নিষ্প্রাণ নিঝুম পুরীতে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তোলে। যৌবনের অফুরান প্রাণশক্তির উদ্দীপনায় চঞ্চল বাংলার রূপকথা।

তবু রূপকথায় মাতৃচিত্রের অভাব নাই। অবশ্য নবজাতককে নিয়ে ছড়ার মায়ের উল্লাস ও হাস্যোজ্জ্বল চিত্র এখানে বেশি দেখা যায় না। বরং ব্রতের মায়েদের দৈব নির্ভরতা ও দুঃখসহন ক্ষমতার সঙ্গে রূপকথার মায়েদের মিল অধিক। 'পুষ্পমালা' উপাখ্যানে দেখা যায়, রানী ও কোটাল্নী কারও সন্তান হয় না। সন্তান কামনা করে তাঁরা উভয়েই গেলেন পুত্র সরোবরে স্নান করতে। সত্যে আবদ্ধ হয়ে তাঁরা স্নান করলেন, তিন সত্য শপথ করে দুই ঘাটের দুই পদ্মফুল ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিলেন। ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুই পদ্ম একত্র হল, দুজনেই উলু দিয়ে উঠলেন। তাঁদের কামনা—যদি তাঁদের ছেলেমেয়ে হয়, তবে তাদের বিয়ে দেবেন। এইটেই হল সত্যকারের ব্রতের রূপ। ব্রতের মায়েদের সত্য প্রাণের সত্য। সে সত্যের সাক্ষী আকাশের সূর্য, নদীর জল, বনের বৃক্ষ।

ব্রতের মায়েদের দেবনির্ভর কল্যাণী মূর্তিও রূপকথায় দুর্লভ নয়। তাঁদের কেউ রাজরানী, কেউ সওদাগরের জননী, কেউ বা দীনদরিদ্রা দুঃখিনী। কিন্তু তাঁরা সকলেই সংস্কারের বশ, দৈবে বিশ্বাসী। 'মধুমালা' গল্পের রাজপুত্র মদনকুমারের মা একান্তভাবে দেবনির্ভর। তিনি 'এ মন্দিরের ধুলা, ও মন্দিরের আশীর্বাদ' ছেলের মাথায় দেন; সওদাগর-জননী 'সাতপুতি চালনবাতি' সাজিয়ে মঙ্গল কামনায় নৌকা বরণ করেন—দীন দুঃখিনী জননীরাও ছেলের মাথায় দেন অনাড়ম্বর ধানদূর্বার আশীর্বাদ।

রূপকথার মা দুঃখিনী মা। দুঃখ নানা কারণে। আঁতুড়ে

বিধাতা পুরুষ এসে শিশুর কপালে ভাগ্য লিখন লিখে যান। কোন শিশুর আয়ু মাত্র বারো দিন। শুনে মায়ের প্রাণ উড়ে যায়। কখনও আবার এই স্বল্পায়ু শিশুর হাতেই মেয়ের মাকে কন্যা সমর্পণ করতে হয়। মা চোখের জলে মেয়েকে বিদায় দিতে বাধ্য হন। আবার কখনও গণকের গণনায় জানা যায়, মেয়ের জন্ম অলক্ষ্মীর অংশে। তাকে বনবাসে পাঠাতেও মায়ের বেদনার অন্ত থাকে না।

কোথাও নিজেদের কপাল দোষেই মা দুঃখভাগিনী। যেমন, বুদ্ধু আর ভূতুমের দুই মা। দুই জনেই ছিলেন রাজরানী। কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে একজনের পেটে হল একটি পেঁচা, তার নাম ভূতুম, আর একজনের পেটে হল একটি বানর, তার নাম বুদ্ধু। মানুষের পেটে পেঁচা-বানর হল। রাজপুরীতে মায়েদের ঠাঁই হল না। দুঃখিনী মায়েরা ছেলে দুটিকে বুকে নিয়ে পুরীর বাইরে এলেন। ভূতুমের মা হলেন চিড়িয়াখানার বাঁদী, আর বুদ্ধুর মা হলেন ঘুঁটে কুড়াণী দাসী। কুঁড়ে ঘরে তাঁদের বাস। কিন্তু মায়েরা এত দুঃখের মধ্যেও ছেলেদের নিয়ে কুঁড়ে ঘরেই সুখের স্বর্গ রচনা করলেন। মাতৃস্নেহই স্বর্গ। এই স্নেহে অভাবের ঘরেও হাসির ফুল ফোটে। রূপকথার দুঃখিনী মায়েদের হৃদয় যেন স্নেহসিক্ত প্রদীপের শিখা। দুঃখের রাতেও তাঁরা এই শিখা জ্বালিয়ে রাখেন। আবার দুঃখনিশার অবসানে এই স্নেহশিখা আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে। বুদ্ধু ভূতুমের মায়েদেরও দুঃখের শেষ ছিল না। বুদ্ধু ভূতুম মায়েদের বুক শূন্য করে দূরে চলে গিয়েছিল। সেদিন মায়েদের মনস্তাপ অবর্ণনীয়। তাঁরা কেঁদে কেঁদে মরমর হয়েছিলেন। বহুদিন প্রতীক্ষার পরে হতাশ হয়ে তাঁরা জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলেন।

এমন সময় একদিক হইতে বুদ্ধু ডাকিল—“মা”!

আর একদিক হইতে ভূতুম ডাকিল—“মা”!

দীন দুঃখিনী দুই মায়ে ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন—

বুকের ধন হারামণি বুদ্ধু আসিয়াছে!

বুকের ধন হারামণি ভূতুম আসিয়াছে!

বুদ্ধুর মা, ভূতুমের মা, পাগলের মত হইয়া ছুটিয়া দুই জনে দুই জনকে বুকে নিলেন।"

দুঃখনিশার অবসানে মায়ের এই রকম অনেক ছবি রূপকথার পাতায় পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

রূপকথায় স্নেহময়ী মায়ের দুঃখ সবচেয়ে উত্তাল হয়েছে সপত্নীর ষড়যন্ত্রে। সতীন 'সাপিনী বাঘিনী।' তারা হিংসুক, ক্রূর। তাদের ভিতর কেউ বন্ধ্যা। সন্তান স্নেহের স্বাদ তারা পায় নাই। তাই সন্তানবতী সপত্নীর সৌভাগ্যে তারা হিংসাকাতর। আবার কেউ সন্তানবতী হয়েও মাতৃ-নামের কলঙ্ক। ঈর্ষায় তারা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। তাদের কুট কৌশলের শিকার হয়েছেন সত্যকারের বাৎসল্য-ময়ী জননী। এমন মায়েদের ভিতর একজন হলেন, সাত ভাই চম্পা ও পারুলের মা। তিনি ছিলেন ছোটরানী। তাঁর সাত ছেলে ও এক মেয়ে হয়েছিল। ছেলে তো নয়, চাঁদের পুতুল, মেয়ে তো নয়, ফুলের কলি। দেখে হিংসায় জ্বলে উঠল অন্যান্য রানী। তারা সেই চাঁদপানা ছেলেমেয়েদের হাঁড়ির মধ্যে ভরে সরায় মুখ ঢেকে ছাইয়ের গাদায় পুঁতে রাখল। রাজাকে জানাল ছোট-রানীর পেটে হয়েছে ব্যাঙ আর ইঁদুর। শুনে রাজা ছোটরানীকে পুরী থেকে বের করে দিলেন। রানী হলেন ঘুঁটে কুড়ানী দাসী। মায়ের এ দুঃখের শেষ কোথায়? তাঁর সমব্যথী প্রকৃতি—"পোড়াকপালী ছোটরানীর দুঃখে গাছ-পাথর ফাটে, নদী নালা শুকায়।"

গল্পের শেষে অবশ্য মায়ের দুঃখ ঘুচেছে। মায়ের সাত ছেলে ও মেয়ে চাঁপা ও পারুল হয়ে ফুটে ছিল পাঁশ গাদার উপর। সেই ফুল তুলতে এল মালী। কিন্তু ফুলেরা কারও কাছে ধরা দিল না। না মালী, না রাজা, না বড়রানী বা মেজরানী কি সেজরানী। ফুলেরা

বলল, 'যদি আসে রাজার ঘুঁটেকুড়ানী দাসী তবে দিব ফুল।' ছোট-রানী এলেন, তাঁর হাতে পায়ে গোবর, পরনে ছেঁড়া কাপড়। যেই তিনি ফুল তুলতে গেলেন, অমনি ফুলগুলি হয়ে গেল সুন্দর চাঁদের মত সাত রাজপুত্র, এক রাজকন্যা। তারা 'মা মা' বলে ডেকে মায়ের কোলে-কাঁখে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অলৌকিক হলেও, এ গল্পে মায়ের স্নেহের আকর্ষণী শক্তির প্রকাশ। এ স্নেহ মৃতকেও সঞ্জীবিত করে। মাতৃস্নেহ 'সঞ্জীবনী সুধা'। বঙ্গবাসী যে 'মা-পাগল' তার মুখ্য কারণ মায়ের বুকভরা স্নেহ। তাই বাঙালীর 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান্।'

এমনই আর এক দুঃখিনী রানী শীত-বসন্তের মা। তিনিও দুয়োরানী। কিন্তু সতীনের ষড়যন্ত্রে তিনি টিয়ে হয়ে উড়ে গেলেন। হিংসুটে সুয়োর তাতেও জ্বালা মিটল না। 'রণমূর্তি' সৎ মা, জল্লাদকে ডেকে আদেশ দিল, শীত বসন্তের রক্ত নইলে নাইব না। কিন্তু জল্লাদের মানুষের প্রাণ। সে গভীর বনে নিয়ে গিয়ে রাজপুত্রদের ছেড়ে দিল, শেয়াল-কুকুরের রক্ত এনে দিল সুয়োরানীকে। তারপর কত দুঃখের দিন, দুঃখের রাত কেটে গেল। টিয়ে ফিরে পেল ছোটরানীর রূপ। আর সেই সঙ্গে দুঃখিনীর যাদুধন দুই ছেলে ও রাজকন্যা পুত্রবধূ। কথার শেষে মা ও ছেলেদের সে মিলন দৃশ্য অপূর্ব। রাজসভায় গিয়ে রানী ডাকলেন, 'আমার শীত-বসন্ত কৈ রে।' রাজ সিংহাসন ফেলিয়া শীত উঠিয়া দেখেন—মা! বসন্ত উঠিয়া দেখেন—মা।

পলকে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁরা। এ দৃশ্য স্বর্গীয়। একদিকে মায়ের চোখে জল, আর একদিকে ছেলেদের খুশী মুখের মধুর হাসিতে ধরার আকাশে রামধনু।

রূপকথার মায়েরা দুঃখিনী হলেও, দুঃখের মধ্যেও হৃদয়ের উচ্চাশাকে তাঁরা জাগিয়ে রেখেছেন। ছেলেরা দুঃসাহসিক কাজ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, এ কামনাও তাঁদের অন্তরের কামনা। বুদ্ধু-

ভূতুমের মায়েরা সেই ইচ্ছা নিয়েই অন্তরের শুভ আশীর্বাদ জানিয়ে ছেলেদের উদ্দেশ্যে সুপারির ডোঙ্গা জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ময়ূরপঙ্খী নাও যে কাজ করতে পারে নি, মায়ের আশীর্বাদপুষ্ট সুপারির ডোঙ্গা সেই অসাধ্য সাধন করেছিল।

শীত-বসন্তের মা সতীনের তুকে টিয়ে হয়ে এক রাজকন্যার পিঞ্জরে আশ্রয় পেয়েছিলেন। রাজকন্যার স্বয়ংবর হবে। মায়ের ইচ্ছা, রাজকন্যার বর হোক তাঁরই ছেলে। ছেলের প্রতিষ্ঠা হোক বীরত্বের ভিতর। তাই তিনি রাজকন্যাকে বললেন, যে বর গজমোতি আনতে পারবে, রাজকন্যার উচিত তাঁকেই বরণ করা। শুনে রাজকন্যা রূপবতী সেই পণ ঘোষণা করলেন। কিন্তু গজমোতি কি যে-সে সংগ্রহ করতে পারে? ক্ষীর সাগরের পদ্মবনে 'দুধের বরণ হাতীর মাথে গজমোতি।' সেই গজমোতি আনতে গিয়ে কত রাজপুত্র প্রাণ হারিয়েছে। অসাধ্য সাধন করল, দুঃখিনী মায়ের প্রাণের ধন বসন্ত। সে সংবাদে মায়ের কি আনন্দ! সোনার টিয়ে পিঞ্জরে ঘোরে, ঘোরে আর কেবলি কয়—

দুঃখিনীর ধন সাত সমুদ্র ছেঁচে এনেছে মাণিক রতন!
রাজকন্যা শুধালেন, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে, টিয়া?'
টিয়া মনের আনন্দে উত্তর করল, 'যাদু আমার
এল কন্যা, গজমোতি নিয়া।'

সন্তানগর্বে মায়ের এই গর্ব, বাঙালী মায়ের আর একটি দিক উদ্ঘাটন করেছে। বাঙলার মা দুঃখিনী, কিন্তু তাঁর আশা অতি উচ্চ। ভূমির মায়ের অন্তরে ভূমার স্বপ্ন সাধ। সন্তানের কাছে তাঁর অনেক প্রত্যাশা। সন্তানকে অলসে-লালসে দিন কাটাতে দেখলে তাঁর অন্তর বিদীর্ণ হয়। কঠিন কর্তব্যের পথে চালিত করতে বাংলার মা সন্তানকে বিপদের মুখে পাঠাতেও দ্বিধা করেন না। রূপকথায় এমন আর

একটি মা 'শঙ্খমালা' গল্পের শঙ্খ সাধুর জননী। শঙ্খমণির বাবা ছিলেন বিখ্যাত সওদাগর। তাঁর চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর পাল তুলে সমুদ্রে পাড়ি দিত। বিদেশ থেকে নিয়ে আসত ধন-রত্ন। কিন্তু সওদাগরের মৃত্যুর পর ছেলে বাণিজ্যের নাম করে না। সে 'পদ্ম ভাঙ্গে ক্ষীর খায়, নাক ডাকাইয়া ঘুম যায়।' আর গানবাজনা বাঁশী নিয়ে তার দিন কাটে। মা কত বোঝান, 'ধনরত্নকড়ি, না বিয়ালেই বুড়ী।' শঙ্খ সে কথা কানেও তোলে না। অভাব চরমে ওঠে। মা খবর পান, বংশের চৌদ্দডিঙ্গা জলের তলে। মা ছুটে যান ছেলের কাছে। প্রথমে অনুনয়, তারপর গর্জন করে বলেন, শঙ্খ রাজা নয় যে রাজার হালে দিন যাবে, সে জেলে-মালীও নয় যে তুচ্ছ কর্মে মগ্ন হয়ে থাকবে। সে সওদাগর, বাণিজ্যই তার সম্বল। বাণিজ্যে যেতেই হবে। মায়ের ওজস্বিনী বাক্যে শঙ্খের মোহ ভাঙল। সে স্বীকার করল বাণিজ্যে যাবে। মা সঞ্চয়-ডালা খুলে সঞ্চিত ধন ছেলের হাতে দিলেন। ছেলেকে শিখিয়ে দিলেন বাণিজ্যের কৌশল —

'শঙ্খ! বুকের রক্ত চোখের তারা 'বাস্তু' সাপের মণি এই
বাস্তু ভিটার কড়ি। শিব শঙ্করের নাম নিয়া তোকে
দিলাম। বাপ্ বুঝিয়া বেপার করিস্। এক
কড়ি কম করিতে পঞ্চ কড়ি দ্বিগুণ করিস্।
আপন কাহন বুঝিয়া নিস্। হাজার
তুফান পাড়ি দিয়া ঘাটের ভরা
ঘাটে বুঝাস্।'

মা ধানদূর্বা তেলসিন্দূর বাতি দিয়ে নৌকা বরণ করলেন। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে 'দিক্ পবনের' বাতাসে পাল তুলে শঙ্খসাধুর চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর সাগরে ভাসল।

রূপকথায় বণিকজননীর এই চিত্রটি অভিনব। সোনার বাংলায় একদিন নৌবাণিজ্যের প্রসার ছিল। বণিক ভরা সাজিয়ে বাণিজ্যে যেতেন, সঙ্গে নিয়ে ফিরতেন কত গন্ধদ্রব্য, ধনরত্ন। বণিকের যাত্রা অকূল সাগরে, ঝড়তুফান বিপদের মাঝে। কোথা থেকে প্রেরণা পেতেন সাধু?—প্রেরণা মায়ের বুকভরা আশীর্বাদ। হারানো সেই সোনার রঙের দিনগুলির স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস জেগেছে শঙ্খসাধুর মায়ের কথায়। বণিকের বংশগর্ব, অভিজ্ঞতা, সঞ্চয়প্রবণতা ও বুদ্ধির প্রবীণতা এবং সেই সঙ্গে মাতৃস্নেহের গভীর প্রকাশ বঙ্গজননীর একটি বিশেষত্বের প্রতিই অঙ্গুলিসঙ্কেত করে।

রূপকথার রূপক কথায় বাংলার মায়েদের এমনই অনেক বিচিত্র সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালী জননীর ত্যাগ, ধৈর্য ও তিতিক্ষার কাহিনী রূপকথায় ছড়িয়ে আছে। বাংলার মা দুঃখিনী, কিন্তু তাঁর অন্তরে আছে উচ্চ সাধ। তিনি স্নেহ বিহ্বল ও কোমল—কিন্তু সময় বিশেষে বহ্নিতেজে তেজস্বিনী। তাঁর অগাধ স্নেহ সন্তানকে ধরেও টানে, আবার বিঘ্ন বিপদের মুখে দূরেও সরিয়ে দেয়। সন্তানকে বীর্যে-সম্পদে প্রতিষ্ঠিত দেখেই তাঁর আনন্দ।

গ্রাম-গীতিকায় মা

গ্রাম বাংলার গীতিকা মাটির গন্ধে ভরা। মাটির সঙ্গে যোগ থাকলেও ব্রতকথা ও রূপকথার পটভূমি ভিন্ন। ব্রতকথার মাটির যোগ স্বর্গের সঙ্গে। দৈবী মায়ায় এখানে অলৌকিক অঘটন ঘটে। রূপকথার উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটে তেপান্তরের মাঠে, ঐরান জঙ্গলে, সাগরবুকে, মেঘলোকে বা পাতালপুরীতে। কিন্তু গ্রাম গীতিকার স্থায়ী আসন গ্রাম বাংলার মাঠ, ঘাট ও খড়ো কুটীর। সেখানে মাঠে 'আগ রাঙা' শালিধানের গোছা ভূমিতে লুটোপুটি খায়, পল্লীর ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেপারির নৌকো 'ভাটি গাঙ্' বেয়ে রংদিয়া বা পরীদিয়ার চরের দিকে যাত্রা করে। গ্রামের বুকে শোভা পায় উলুছনে ছাওয়া একচালা, চৌচালা, বা আটচালা ঘর। গাঁয়ের পিছনে—

'আন্ধা পুকুর ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা।
চাইর দিকে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া॥'

এই পরিবেশে বাংলার মায়েরা ঘর করেন। এখানেও নারীর বুকে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নিদ্রায় দৈব স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। মায়েরা সন্তানকামনায় ব্রত-আর্চা করেন বা পীরের দরগায় ছিন্নী মানেন। বিশ্বাস বাস্তব সত্যে পরিণত হয়। মায়ের বুক আলো করে 'পুন্নমাসির চান্' উদিত হয়। 'কেনারাম' পালায় দেখা যায়, অপুত্রবতী যশোধারা দেবী মনসাকে স্বপ্নে দেখে তাঁর পূজা করে পুত্র লাভ করেন, 'সুন্দর ছাওয়াল হৈল মনসার বরে।' শুধু তাই নয়, 'দেবীর পূজায় কিনা' তাই নাম হল কেনারাম। 'ছুরৎ জামাল' পালার দেওয়ান পত্নীও স্বপ্ন দেখেছিলেন, 'পুন্নমাসী চান্ যেন কোলেতে লইল্।' এই স্বপ্নের ফল রূপবান্ ছুরৎ জামাল।

তবু গ্রাম-গীতিকায় শিশু সন্তানকে ঘিরে মাতৃস্নেহের উল্লাসের চিত্র অতি অল্প। মাতৃস্নেহের বিষয় বিভাব এখানে যুবক পুত্র বা যুবাবতী কন্যা, বিশেষতঃ প্রথম যৌবনের রূপসী কন্যা। সে কন্যা শৈশব অতিক্রম করতে না করতে এগার-বার বছরে পা দেয়। আষাঢ়ের নয়া জলের মত দেহে রূপের ঢল নামে। চিকন কালো দীঘল কেশের আঁড়ালে তার মুখের শোভা দেখে 'আসমানের চাঁদ সুরুয আবেতে লুকায়।' মেয়েদের এ বয়সে মায়েদের স্নেহের রূপ ভিন্নতর। বাৎসল্য সাগরে তখন আশা, উদ্বেগ ও চিন্তার তরঙ্গ। দুরুদুরু কম্পনে কম্পিত মাতৃহৃদয়। তখন চিন্তা, এ মেয়ে কার হাতে পড়বে। 'দেওয়ান ভাবনা' পালার সোনাইর মা সোনাইকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। স্বামী নাই। কে মেয়ের বিয়ের খোঁজ করবে? নিরুপায় মা মেয়েকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন ভায়ের বাড়ীতে। দিকে দিকে ঘটক পাঠানো হল। কিন্তু কোথাও 'সোনাইর বিয়া দিতে মায়ের মন না উঠিল।' মা যে অবস্থারই হোন্ না কেন, মায়ের আশা, জামাই হবে সুন্দর, কুলেশীলে বর হবে বড় ঘরের বেটা। কিন্তু সে স্বপ্নসাধ প্রায়ই পূর্ণ হয় না। তার কারণ গ্রাম বাংলার অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা। সোনাইর মা-ও আশাহতা হয়েছিলেন।

সেকালে গ্রাম বাংলায় বিভীষিকা সৃষ্টি করত উচ্ছৃঙ্খল জমিদার, কাজী বা দেওয়ান। দুরন্ত লালসার বশে মায়ের বুকের দুলালীকে তারা হরণ করে নিয়ে যেত। কখনও বা বিপদের নিশানা পেয়ে কন্যা নিজেই গৃহত্যাগ করত। সেদিন অভাগী মায়েদের দুঃখ রাখবার ঠাঁই থাকত না। 'ধোপার পাট' পালার কাঞ্চনের মা, 'কমলা' পালার কমলার মা এমন মায়ের দৃষ্টান্ত। বেদনাহত, স্তব্ধ সে মূর্তিগুলি করুণ ও অশ্রুসজল।

পল্লীগীতির জননী চোখের জলের অশ্রুমতী প্রতিমা হলেও ক্বচিৎ

কোথাও তাঁদের বাৎসল্য হাসির ঝলক হয়ে ফুটেছে। মেয়েদের বিবাহ উপলক্ষ্যে স্ত্রী-আচারে এই আনন্দ-হাসি যেন মেঘ ভাঙা-চাঁদের মত জ্যোৎস্না ছড়িয়েছে। জল-সওয়া, সোহাগ-মাগা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কন্যার সৌভাগ্য কামনায় মাতৃবাৎসল্যের এই দিকটি উদ্‌ঘাটিত—

শ্বশুর বাড়ি গিয়া কন্যা
থাকুক সোহাগে।
সে কারণে কন্যার মাও
ভাল সোহাগ মাগে॥

'ধনা-মনা' ছোঁয়ানোর ব্যাপারটিও এই লক্ষ্যে—

ধন ছুঁয়াইল মায়
ধন পাইবার আশে।
মন ছুঁয়াইল মায়
জামাই অভিলাষে॥

একদিকে বেদনা শঙ্কা উদ্বেগ, অন্যদিকে আশার আনন্দ। প্রভাত-গোধূলির রঙে অনুরাঞ্জিত বাঙালী মায়ের এই চিত্রগুলি করুণ-মধুর।

আবার ছেলের বিবাহ উপলক্ষ্যে বঙ্গ জননীর আর এক রূপ। সেখানে আর চোখের জল নয়, আনন্দ-উল্লাসের লহর। ছেলে ও ছেলের বৌ—দুইই মায়ের আদরের ধন। ছেলে যেদিন নব-বধূকে নিয়ে গৃহে ফিরে আসে, সেদিন মায়ের আর এক মূর্তি। মা ছেলের চাঁদ মুখ মুছিয়ে ছেলেকে কোলে নেন, ঘরের লক্ষ্মী নব-বধূকে ধান-দূর্বায় বরণ করে বুকে জড়িয়ে ধরেন। শুভ-আশীর্বাদের সঙ্গে অন্তরের স্নেহ উথলে ওঠে।

পল্লী গীতিকার আনন্দোজ্জ্বল মাতৃচিত্র অর্ধস্ফুট। গীতিকার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ মিলন বিরহ। এই প্রেম-

কথার ফাঁকে ফাঁকে বাৎসল্যের ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে। তারই ভিতর যতটা সম্ভব বঙ্গজননীর চিরন্তন হৃদয়াবেগ কল্লোলিত। তবে যে সকল গীতিকায় স্বামীহীনা মাতাই পুত্র বা কন্যার অভিভাবিকা, সেখানে মাতৃচিত্র পূর্ণস্ফুট। এই হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মলুয়া' পালার চাঁদবিনোদের মা। অভাব ও সামাজিক পীড়নের মুখে এই মাতৃচিত্র পূর্ণ প্রস্ফুট পদ্মের মত স্নিগ্ধ, কোমল এবং সুরভিত। নিম্ন মধ্যবিত্ত বঙ্গজননীর আশা ও নিরাশা, গভীর মমত্ব বোধ, মিলন-বাৎসল্যে আত্মহারা ভাব এবং বিরহ বাৎসল্যের ব্যাকুল ক্রন্দন এই মাতৃচিত্রে পূর্ণতা লাভ করেছে। চাঁদবিনোদের মায়ের মাতৃত্ব শুধু পুত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় নাই, পুত্রবধূ মলুয়ার প্রতিও তাঁর বাৎসল্য সমভাবে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে। 'দুরন্ত দুষমণ' কাজীর বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াতে পারেন নাই, সামাজিক অন্যায় বিধির বিরুদ্ধেও অসহায় নারীর প্রতিবাদ গর্জন করে ওঠে নাই, তবু পাষাণ-চাপা ভোগবতীর মত তাঁর চোখের জল গুমরে উঠেছে। সমাজের বিধানে মর্মাহত বধূ যখন আত্মবিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছে, তখন শাশুড়ী হলেও তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের আর্তি দিঙ্‌মণ্ডল বিধূনিত করেছে—

শুন গো পরাণবধূ
  কইয়্যা বুঝাই তরে।
ঘরের লক্ষ্মী বৌ আমার
  ফির‍্যা আইস ঘরে॥
ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের আলো
  আন্ধার ঘরের বাতি।
তোমারে না ছাইরা থাকবাম
  এক দিবারাতি॥

পল্লী গীতিকায় মুসলমান মায়েদের ছবিও খুব উজ্জ্বল। এখানে

বিষয়-বৈচিত্র্যে মাতৃস্নেহও বিচিত্র। তাঁদের ছেলেরা কেউ নৌকার মালুম, কেউ বা বেপারী সাধু। বালাম নৌকা নিয়ে এই সব ছেলে মাঝ দরিয়ায় যাত্রা করে। তাদের জন্য চিন্তায় মা বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। কখনও সমুদ্রে নৌকাডুবি হয়। কোলের সন্তান আর ফিরে আসে না। সেদিন মায়ের বুক ভাঙা আর্তনাদে পল্লীর গৃহ মুখরিত হয়। পুত্রশোক যেন ছাই চাপা আগুন। আমৃত্যু এই শোক সুযোগ পেলেই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। 'নুরন্নেহা' পালায় নজু মিঞার মায়ের শোক কে ভুলতে পারে? নজু মিঞা নৌকা-ডুবিতে প্রাণ হারিয়েছিল। মা প্রতীক্ষা করে থাকতেন, জোয়ার এলেই ছেলে ঘরে ফিরবে। দীর্ঘদিনের ব্যর্থ প্রতীক্ষা বার্ধক্যেও গুমরে উঠত। সাগরে জোয়ার এলেই তিনি আর্তনাদ করে উঠতেন—

জোয়ারে না আইলি রে পুত
ভাডায় না আইলি।
কোন্ হাঙ্গরে কোন্ কুমীরে
মোর পুতেরে খাইলি॥

মুসলমান মায়েদের আর একটি বেদনাও অত্যন্ত গভীর। মুস্লিম সরামতে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। সতীনের ভয়ে তাই কাতর মাতৃহৃদয়। 'সতীন বুঝয়ে নাহি সতী পুত্রের ব্যথা।' 'দেওয়ান-মদিনা' পালায় তাই দেখা যায়, আলাল-দুলালের মা, কইতরা-কইতরীর কাহিনী শুনিয়ে পরাণের পতিকে কাছে ডেকে মৃত্যুকালে মিনতি করে বলছেন—

সোনার কলি আলাল-দুলাল
তারার দিকে চাইয়া।
আমার মাথা খাও পিয়া
আর না কর বিয়া॥

বঙ্গজননীর সন্তান-স্নেহ শুধু জীবৎকালেই সজাগ নয়, মৃত্যুর পরেও বুঝি এ বাৎসল্য বিনিদ্র ও সক্রিয়।

দেওয়ান বিষয়ক পালাগুলিতে মুসলমান মায়েদের হৃদয়-সংবাদ আরও বিচিত্র ও ঘটনাবহুল। রাজনৈতিক কোলাহলে এই পালাগুলি মুখর। বাংলার দেওয়ানেরা ছিলেন স্বাধীনচেতা বীর। দিল্লির বাদশাহের বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ ইতিহাস-খ্যাত। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মৃত্যুযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁরা দ্বিধাবোধ করতেন না। যুদ্ধ-বিগ্রহে রক্তাক্ত এই পালাগুলির মাতৃহৃদয়ও রক্তক্ষত। বীর মাতা এখানে পুত্র গর্বে গরবিনী অথচ বেদনায় আপ্লুত। পুত্রের যুদ্ধোদ্যমকে তাঁরা সমর্থন জানাতেন বটে, কিন্তু অন্তরে জেগে থাকত শঙ্কা ও উদ্বেগের ধূম। 'ছুরৎ জামাল' পালার ফতেমা বিবি, 'ঈশা খাঁ মসনদআলি' পালার বেগম নিয়ামত জান এবং 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' পালার ফিরোজ-জননী এই ধরনের মায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এঁদের বাৎসল্য যেন দুধ-সাগরের রক্তকমল।

ফতেমা বিবি ছিলেন আলাল খাঁ দেওয়ানের পত্নী। ছুরৎ জামাল তাঁর পুত্র। আলাল খাঁ ফকীর হয়ে মক্কায় চলে যান। তখন দেওয়ান হয় ভ্রাতা দুলাল খাঁ। কিন্তু দুর্বৃত্ত দুলাল জামালের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। ছেলেকে নিয়ে বিবি ফতেমা তখন আশ্রয় নেন পতির বন্ধু দুবরাজ রাজার পুরে। এখানে থেকে জামাল যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং চাচা দুলালকে পরাজিত করে নিজ রাজ্য উদ্ধার করে। সেদিন দুঃখিনীর ধন পুত্রের গৌরবে ফতেমার কত না আনন্দ। এ আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। জামাল দুবরাজ রাজের কন্যা অধুয়া সুন্দরীর প্রেমে পাগল হয়ে সৈন্য নিয়ে দুবরাজপুর আক্রমণ করে। এদিকে পরাজিত দুলাল খাঁ আলাল খাঁকে মক্কা থেকে ফিরিয়ে এনে জামালের বিরুদ্ধে তাঁর কান ভারী করে। আলালের নির্দেশে জামালকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়। তারপর জামালকে পাঠানো হয় দিল্লীর

ফৌজে বাদশাহের পক্ষে লড়াই করতে। সংবাদ শুনে চমকে ওঠেন ফতেমা। জামাল মায়ের কাছে বিদায় নিতে এলে, 'হায় পুত্র বল্যা বিবি পড়িলেন ঢুলি।' তবু বিদায় দিতে হল। এই বিদায় শেষ বিদায়। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এল জামালের মৃত্যু সংবাদ। 'শুনিয়া ফতেমা বিবি হইল অজ্ঞান।' এ জ্ঞান আর ফিরে এল না। 'তিনদিন পরে বিবি হারাল পরাণি।'

এমনই আর একটি চরিত্র দেওয়ান ফিরোজ খাঁর মাতা। ফিরোজ ঈশা খাঁর বংশের সন্তান। তাঁরও রক্তে বিদ্রোহের বীজ। তাঁর প্রতিজ্ঞা, দিল্লীর বাদশাকে সে রাজস্ব দিবে না। মা খবর দিয়ে ছেলেকে অন্দরে আনালেন : বললেন, দুঃখ দিও না, বিয়ে কর, রাজত্ব কর। পুত্র বিবাহ করবে, কিন্তু বিবাহ করবে শত্রু পক্ষের কন্যা উমর খাঁর মেয়ে সখীনাকে। অমত থাকলেও মা বিবাহের উদ্যোগ করলেন। কিন্তু উমর খাঁ সে প্রস্তাবকে উপেক্ষা করলেন। বীর ফিরোজ বীর বিক্রমে উমরকে পরাজিত করে সখীনাকে হরণ করে এনে সাদি করল। কিন্তু পরাজিত উমর প্ররোচিত করল দিল্লীর বাদশাকে। ফলে আক্রান্ত হল জঙ্গলবাড়ি। ফিরোজ যাত্রা করলেন শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলেন ফিরোজ-জননী। সংবাদ এল যুদ্ধে ফিরোজ বন্দী হয়েছে। এবার বীরাঙ্গনা সখীনা রণবেশে সজ্জিতা হল। সেদিন মায়ের দিলের দরদ কে বুঝবে? বীরত্বের গর্বে হৃদয় স্ফীত হয়, কিন্তু রণক্ষেত্রের কারুণ্য সে হৃদয়কে চূর্ণ করে দেয়। গর্ব ও শোকের রণক্ষেত্র মায়েরই হৃদয়।

' বঙ্গজননীর স্নেহবিহ্বল চিত্র প্রায়ই চোখের জলে আঁকা। তবু কোথাও কোথাও এরই ভিতর প্রকাশ পেয়েছে কোমল প্রাণের কঠিন তেজ, দুরূহ কর্তব্যে অনমনীয় সাহসিকতা এবং উচ্চাভিলাষ ও নৈতিক আদর্শ। সন্তানকে তাঁরা প্রাণের অধিক ভালবাসেন। এই

ভালবাসায় থাকে উচ্চাশার স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে তাঁরা দুঃসহ দারিদ্র্যের ভিতর দুঃখব্রতে ধৈর্য সহকারে লালন করেন। কিন্তু সন্তানকে কোন দিকে নীতিভ্রষ্ট হতে দেখলে, এই স্নেহ আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে ক্ষোভে ক্রোধে গর্জন করে ওঠে। 'মানিকতারা' পালার কালুর মা এইরূপ একটি মায়ের চিত্র। 'দশকাউনা' গঞ্জের ঘাটে পাগলা নদ ব্রহ্মপুত্রের তীরে বাস করত বিশু নাপিত। তার এক বৌ, পাঁচ ছেলে। বড় ছেলে বাসু। তার নামেই নাপিতনীর পরিচয় 'বাসুর মা'। কপালের ফেরে তার চার ছেলের অকাল মৃত্যু হল, স্বামীও প্রাণ হারাল নদীর চাপ ভেঙে। নিঃসম্বল বাসুর মা চোখে অন্ধকার দেখলেন। মনের দুঃখে তিনি চললেন জলে ঝাঁপ দিতে। পিছনে 'মা মা' বলে কেঁদে উঠল বাসু। এই মধুর ডাকে মায়ের মরা হল না। বাসুকে নিয়ে তিনি স্বামীর ঘর আঁকড়িয়েই রইলেন। তাঁর জীবিকা হল ভিক্ষা, আর একমাত্র স্বপ্ন হল বাসুকে মানুষ করে তোলা—

এক বাসুক লইয়া নারী
কুইড়্যা ঘর না ছাড়ে।
পংখী যেমুন পাংখার তলে
বাচ্চা পহর পারে॥

এই অসময়ে তাঁর সহায় হল কুচনীপাড়ার 'কানুর মা'। তিনি বাসুর মাকে চাল-ডাল দিয়ে সাহায্য করতেন। কিন্তু বাসুর মা বসে থাকতেন না, গতর খাটিয়ে পাড়ার লোকের ধান ভেনে দিন চালাতেন।

ক্রমে বাসু হল 'বিশ বছরের জোয়ান'। কানু তার সমবয়সী। গলায় গলায় ভাব। কানু ওস্তাদ, বাসু সাগরেদ। কিন্তু বাসুর মায়ের না-পছন্দ। কানু বাঁকা পথে চলে। মা বারণ করতে পারেন না, সইতেও পারেন না। একদিন গভীর রাতে কানু বাসুকে ডেকে

বাইরে নিয়ে গেল। বাসুর মা ভয়ে অস্থির। চোখের জলে তিনি দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন, 'বুকের সোনা বুকে দেও আমার।'

বুকের সোনা বুকে ফিরে এল পরদিন ভোর রাতে। তার হাতে ধন অলঙ্কারের পোটলা। সেই পোটলা খুলে বাসু আনন্দে ডগমগ হয়ে বলল, 'আর দুঃখ রইব না মা।' কিন্তু কেঁপে উঠলেন মা। তিনি জানতে পারলেন, গঞ্জের হাটে 'ওপারের ভাড়াইটা' ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে মেরে কানুর পরামর্শে লুঠ করা হয়েছে এই ধন-অলঙ্কার। শুনে গর্জন করে উঠলেন বাসুর মা—

হৈয়া ক্যানে না মরলি রে,
হৈত না এত জ্বালা।
এমন দুষমণের হায়,
ডুইব্যা মরণ ভালা॥

ছেলের অধঃপতনে মা মরমে মরে গেলেন। 'পোলার সাথে গোসা কইর‍্যা কইল না আর রাও।' শুধু তাই নয়, এই মর্মযন্ত্রণাই হল তাঁর কাল।

দুঃখিনী অথচ তেজস্বিনী, দরিদ্র অথচ আদর্শের একাদর্শ এই চরিত্র বাংলার খড়ো কুটীরের মায়ের চরিত্র। অভাব-দারিদ্র্যের পঙ্কে এ পঙ্কজ আর কোথায় ফোটে?

গ্রামগীতিকায় আর এক শ্রেণীর মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁরা গর্ভধারিণী জননী নন্, আপৎকালের আশ্রয়দাত্রী। কোন নায়ক বা নায়িকা বিপদে পড়ে এঁদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। নিজের মা না হয়েও তাঁরা অন্তরের স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন। এঁদের বলা হয়েছে 'ধর্মমাতা বা 'ধর্মের মাও।' মায়ের মতই তাঁদের লালন-নিষ্ঠা, বাৎসল্য ও শুভকামনা।

'ধোপার পাট' পালার অতুনা ধুবনী এমনই একজন ধর্মমাতা।

নায়িকা কাঞ্চন ধোপার মেয়ে। দেশের রাজপুত্র তাকে ভালবেসে-ছিল। রাজার ভয়ে তারা আশ্রয় নিয়েছিল আর এক রাজ্যের আর এক ধোপার বাড়িতে। ধোপা বৌয়ের নাম অত্থনা। তিনি অন্তরের স্নেহ উজাড় করে এদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাজপুত্র বিদেশভ্রমণের কথা বলে কাঞ্চনকে ছেড়ে যায়। কাঞ্চন অত্থনার স্নেহছায়ায় প্রতীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। দুরন্ত রাজার তাগিদদারের লালসা দৃষ্টি পড়ে কাঞ্চনের উপর। সে ধোপাকে ভয় দেখায়, কাঞ্চনকে তার হাতে না দিলে সে ধোপাকে প্রাণে পুড়িয়ে মারবে। সেই বিপদের দিনে অত্থনার ভয় সর্বাপেক্ষা বেশী। ভয় প্রাণের নয়, সতী নারীর সতীত্ব রক্ষায়। তিনি রাত্রির অন্ধকারে কাঞ্চনকে পালিয়ে যেতে বলেন। ধর্মমাতার বিদায়বাণী করুণ মমত্বে ভরা—

‘ধর সুন্দর কন্যা মোর কথা ধর।
এক বছর বঞ্চিলা তুমি আমার ঘর॥
তুমি লো ধর্মের কন্যা আমি তোমার মাও।
আজ রাত্রির কথা রাখ মোর মাথা খাও॥
ধর্ম রাখ সতী কন্যা যাও অন্য ঠাঁই।
আজ রাইতে রক্ষা করুন বিপদে গোঁসাই॥’

এমনই আর একজন ধর্মমাতা ‘রূপবতী’ পালার পুনাই। তিনি শুধু স্নেহপ্রবণ নন, বুদ্ধিতে প্রখর, কর্তব্যে অটল। মায়ের দায়িত্ব পালনে তিনি নির্ভয়।

রাজচন্দ্র ছিলেন রামপুর শহরের লাখেরাজ জমিদার। তাঁর ঘরে ‘অবিয়াত’ কন্যা রূপবতী। রূপবতীর বিবাহের পূর্বেই নবাব দরবার থেকে রাজচন্দ্রের ডাক আসে। স্ত্রী ও কন্যাকে রেখে তিনি দরবারে যান। দিন যায়, বছর যায়, রাজচন্দ্র ফেরেন না। স্ত্রী ভীত হয়ে

স্বামীর কাছে খবর পাঠালেন—ঘরে সোমত্ত মেয়ে, স্বামী যেন অচিরে ফিরে আসেন। এই সংবাদ কাল হল। নবাব রাজচন্দ্রকে বললেন, রূপবতীকে তার হাতে সমর্পণ করতে হবে, নচেৎ গর্দান যাবে। রাজচন্দ্র চোখে অন্ধকার দেখলেন। বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে সব কথা বললেন। নিরুপায় স্ত্রী পতিকে না জানিয়ে রাত্রিকালে উপস্থিত হলেন কন্যার কাছে, 'শিয়রে দাঁড়াইয়া কাঁদে অভাগিনী মায়।' মেয়ে জেগে উঠল। বিয়ের আচার পালন করা হল না, মঙ্গল জোকার উঠল না। মা মেয়েকে দান করলেন বাড়ির বক্সী মদনের হাতে। মদন নফর হলেও রূপবান্, যেন 'প্রভাতিয়া তারা।' চোখের জলে মা তাকে বললেন, বংশের দুলালী কন্যাকে তোমার হাতে দিলাম, সুখে-দুঃখে ওকে দেখো। এই বলে সেই নিঝুম রাতে ঝি-জামাইকে বিদায় দিলেন। নগরের আর কোন লোক সে কথা জানল না।

মদন আর রূপবতী এসে আশ্রয় নিল এক জেলের ঘরে। জেলের বড় বৌ পুনাই। তিনি হলেন মদন-রূপবতীর ধর্মের মাও—

পোলা নাই পুলি নাই পুনাইর শূন্য ত্রিসংসার।
পুত্রকন্যা পাইল পুনাই ত্রিজগতের সার॥

ওদিকে রাজচন্দ্র শুনলেন, নফর মদন তাঁর কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। 'দুষমণ' কুলে কালি দিয়েছে। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি শহরে বাজারে ডঙ্কা মেরে ঘোষণা দিলেন, মদনকে তিনি বলি দেবেন। মদনকে যে ধরে দিতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেবেন। মদন ধরা পড়ল। কথাটা কানে যেতেই ধর্মমায়ের কাছে আছাড়ি-পিছাড়ি করতে লাগল রূপবতী, 'দেইখা আসি ধর্মের মাও গো ছাইড়া দে।' পুনাই প্রবোধ দিলেন। কিন্তু রূপবতী প্রবোধ মানে না। পরদিন ভোরে ধর্মমাও পুনাই স্বামীকে ডেকে নৌকা সাজাতে বললেন। সেই নৌকায় রূপবতীকে নিয়ে সোজা এলেন রাজচন্দ্রের দরবারে।

ধর্মের দোহাই দিয়ে তিনি অভিযোগ করলেন, 'কোন্ দোষে জামাই মোর বন্দীখানা ঘরে ?' তারপর রাজাকে উদ্দেশ্য করে বজ্র কণ্ঠে বললেন, 'ঘর বান্ধিয়া কেবা তায় আগুন লাগায়।' সভাজন নিশ্চুপ। পুনাই একে একে সব কথা খুলে বললেন, নিশিরাতে কেমন করে রানী মেয়েকে মদনের হাতে দিয়েছেন, কেমন করে মদন-রূপবতী আশ্রয় নিয়েছে তাঁদের ঘরে। অবশেষে রাজাকেই তিনি দায়ী করলেন, 'গালি পারে পুনাই শুনে সভাজন।' রাজার ক্রোধ শান্ত হল, সুবুদ্ধি ফিরে এল, 'সকরুণ মন রাজা ভাসে চক্ষের জলে।' ধর্মমায়ের বুদ্ধিবলে মদন ও রূপবতী ঝি-জামাই রূপে স্বীকৃতি পেল।

পদাবলীর মা যশোদা

মাতা যশোদা সর্বভারতীয় পৌরাণিক মাতৃমূর্তি। তিনি কৃষ্ণের নিজের জননী নন। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর তিমিরঘন নিশায়, কংসকারাগারে দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম হয়। বসুদেব তাঁর পিতা। সেই রাত্রিতে নন্দরানী যশোমতীও একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করেছিলেন। মায়ের চেতনা তখন আচ্ছন্ন ছিল। সেই অবসরে বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার অঙ্কে স্থাপন করে কন্যাটিকে নিয়ে যান। যশোদা চেতনা পেয়ে বুকের কাছে কৃষ্ণকেই দেখেন। জ্ঞানত তিনি কৃষ্ণকে নিজের পুত্র বলেই জানতেন।

এই বালক কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব পুরাণে যশোদার স্নেহপ্লুত বাৎসল্যের চিত্র আঁকা হয়েছে। সে স্নেহের প্রকাশ শিশুর লালন-পালনে, সে স্নেহের প্রকাশ গভীর শঙ্কায়। কৃষ্ণ শৈশবে বহুবার বিপদের মুখে পড়েছেন। প্রতিবারেই রক্ষা পেয়েছেন অদ্ভুত অলৌকিক শক্তিবলে। মায়ের মনে আতঙ্ক ও বিস্ময়। পুতনা বিনাশ, তৃণাবর্ত বধ, শকট ভঞ্জন প্রভৃতি কার্যে বালক কৃষ্ণের ঐশ্বরিক প্রকাশ দেখে মায়ের মনে বিতর্কও উপস্থিত হয়েছে। কখনও কৃষ্ণের বদনে বিশ্বরূপ দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়েছেন। কিন্তু পর-মুহূর্তেই পুত্রস্নেহরূপিণী বৈষ্ণবী মায়ায় বিতর্ক ও সংশয় কেটে গেছে। কৃষ্ণকে তিনি দেখেছেন মানবী বুদ্ধিতে নিজের তনয়রূপে। তাই স্নেহময়ী মা প্রতিবারেই নষ্টপ্রায় সন্তানকে বুকে পেয়ে তাকে স্তন্যপান করাতে করাতে গভীর তৃপ্তিতে মুদিত হয়েছেন। কখনও বা রিষ্টি রোধের জন্য সন্তানের অঙ্গে রক্ষা বেঁধেছেন, দ্বিজ ব্রাহ্মণকে দিয়ে স্বস্ত্যয়ন করিয়েছেন। পুরাণে যশোদার প্রাকৃত জনোচিত বাৎসল্য বৈষ্ণবী মায়ার প্রকাশ।

বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতে বৈষ্ণবী মায়ার প্রসঙ্গ প্রচ্ছন্ন। এখানে যশোমতী 'নিজ প্রেমে পূর্ণ'। কৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত, তনয়জ্ঞানেই তিনি তন্ময়। পুত্রের মাধুর্যে তিনি একান্ত মগ্ন। ছেলের মধুর মেঘশ্যাম বর্ণ, মধুর কমলনয়ন, মধুর মধুরিম হাস। এই মাধুর্যে যশোমতী অভিভূত। মায়ের ভয়, চাঁদ মনে করে রাহু একে গ্রাস না করে। দৈব অনিষ্ট আশঙ্কা করে তিনি সকলকে ডেকে বলেন, তোমরা আশীর্বাদ কর, আমার ছেলে যেন চিরজীবী হয়ে কুশলে থাকে। সাত নয়, পাঁচ নয়, এই একটি মাত্র ধন—'পরাণ পুতলি, দুটি নয়নের তারা'—তার যেন কোন অমঙ্গল না হয়। বাঙালী কবির যশোদা বঙ্গের কোমলপ্রাণা জননীর প্রতীক।

পুরাণের যশোমতী যেন নাটকের চরিত্র, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রিয়া-প্রধান। অনিষ্টভয়ে তিনি সন্তানের অঙ্গে রক্ষাকবচ বাঁধেন, সন্তানকে দেখলেই তাঁর বক্ষ ক্ষীরধারায় সিক্ত হয়। যে-কোন অবস্থায় পুত্রকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করিয়ে তাঁর মাতৃহৃদয় আশ্বস্ত হয়। কিন্তু বাংলার পদাবলীর যশোদা মূর্তিমতী গীতিকবিতা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রিয়া নয়, কথায় তাঁর আত্মপ্রকাশ। এ যশোমতী বাঙ্ময়ী, তাঁর বাৎসল্যও বাঙ্ময়। শিশুকে দেখে মা আনন্দ পান, সেই আনন্দের ভাগ নিতে তিনি অপরকে ডাকেন। আবেগে স্নেহ কলমুখর হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ নৃত্য করেন, 'চরণে চাঁদের হাট' বসে। মা সকলকে ডেকে ডেকে বলেন—

দেখসিয়া রামের মাগো,
গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।

শুধু তাই নয়, দধিমন্থন ধ্বনি শুনে গোপাল কাছে এলেই তিনি ক্ষীর-ননীর লোভ দেখিয়ে যাদুমণিকে নাচতে বলেন। করতালি দিয়ে গদগদ স্বরে বলতে থাকেন, 'তা তা থৈয়া থৈ।' বালক কৃষ্ণকে নিয়ে

নন্দরানীর এই আনন্দোচ্ছ্বাস বাংলার ছড়ার মায়েদের কথা মনে করিয়ে দেয়। পরিতৃপ্ত জননীর সে এক অপূর্ব হাস্যমুখর মূর্তি।

বঙ্গপদাবলীর যশোদার প্রধান বৈশিষ্ট্য আবেগের উচ্ছলতা। পুরাণের যশোদা স্নেহপ্লুত হলেও অধীরা নন। আবেগের প্রচণ্ড প্রমত্ততা থেকে তিনি অনেকটা মুক্ত। কিন্তু বাংলার যশোমতী আবেগোচ্ছল, ব্যাকুল ও চঞ্চল। এই চঞ্চল আবেগময়তা বাঙালী মায়ের প্রকৃতিগত। সে আবেগ ধৈর্যহারা। রবীন্দ্র-চিত্রিত 'আদিজননী সিন্ধু'র মত তাঁর আবেগস্পন্দিত বাৎসল্য উতল, উচ্ছল, চঞ্চল ও মুখর।

শুধু আবেগ নয়, বাংলার মা যশোদা অশ্রুমতী। নয়নের মণি মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল হলেই, চোখের জলে তাঁর চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। ভালো করে তিনি হারানো ছেলেকে খুঁজতেও পারেন না। সহচরীদের ডেকে রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—

'হেদে শ্রীদামের মা শুনগো রোহিণী বা
এ পথে দেখেছ গোপাল মোর।
আর এক বিপরীত যাইতে না দেখি পথ
কাল হৈল নয়নের লোর॥'

শ্রাবণের মেঘের মত তিনি বর্ষণমুখর। শোকের নদী নির্মাণ করে বিধাতা যেন পুত্রোন্মাদ নন্দরানীকে সেই নদীতে নিক্ষেপ করেন। যশোদা সে শোক-নদী উত্তীর্ণ হতে পারেন না। তিনি যে সাঁতারও জানেন না। ঘরে ঘরে খুঁজতে খুঁজতে তিনি কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখে সকরুণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন, কখনও 'আহা মরি হায় হায়' বলে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কখনও মনে করেন, মায়ের প্রতি অভিমান করেই বুঝি গোপাল লুকিয়ে আছে। ভাবাবেগে তিনি কেঁদে বলেন, 'যশোদা মায়ের মুখ চেয়ে' কৃষ্ণ যেন সাড়া দেয়।

বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতে মা যশোদার এই বিরহ-ব্যাকুলতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে কৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা প্রসঙ্গে। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও গোষ্ঠলীলার বর্ণনা আছে। কিন্তু তাতে মায়ের ভূমিকা একান্তই গৌণ। ছয় বছরের বালক কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠাতে গিয়ে মাতৃ-হৃদয়ের কোন বিকার সেখানে দেখানো হয় নাই। তবে গোচারণ শেষে কৃষ্ণের গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে মায়ের তৃপ্তি, স্বস্তি ও আনন্দের ছবিখানি সুন্দর আঁকা হয়েছে। বাঙালী কবিরা সেখানে পূর্ব গোষ্ঠ ও উত্তর গোষ্ঠ—গোষ্ঠলীলাকে এই দুই ভাগে ভাগ করে মাতা যশোদার বিরহ-বাৎসল্য ও মিলন-বাৎসল্যের পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই দুই ভাগই আবেগকম্পিত মাতৃহৃদয়ের বেদনাশ্রু ও আনন্দাশ্রু দ্বারা অভিসিঞ্চিত। বিশেষত পূর্ব গোষ্ঠ অবলম্বনে বাংলার কবিগণ মাতৃ-হৃদয়ের অশ্রু-সাগরকে উত্তাল করে দেখিয়েছেন। কৃষ্ণ গোপঘরে লালিত। গোপজাতির নিয়ম অনুসারে ছেলে পাঁচ বৎসর অতিক্রম করলেই তার হাতে দোহনভাণ্ড দিতে হয় এবং তাকে গোচারণে পাঠাতে হয়। রাখালিয়া বেশে সজ্জিত হয়ে গোপবালকেরা দল বেঁধে প্রভাতকালে গাভীযূথ নিয়ে গোচারণে যায়। একে বলে পূর্ব গোষ্ঠ। আবার সন্ধ্যার গোধূলি লগ্নে মাঠের গাভীগুলিকে নিয়ে তারা ঘরে ফেরে। একে বলে উত্তর গোষ্ঠ। কৃষ্ণকেও গোষ্ঠে যেতে হবে। শুনেই মায়ের প্রাণ কেঁপে ওঠে। স্বপ্ন দেখে তিনি কেঁদে বলেন—

> কুস্বপন দেখেছি আজ নিশীথে।
> যাইতে দিব না গোপাল গোষ্ঠেতে॥

একে একে তিনি প্রকাশ করতে থাকেন মনের বেদন। যে ছেলে ভাল করে কাপড়খানা পরতে পারে না, কাপড় হাতে নিয়ে মায়ের পিছনে ঘোরে, দণ্ডে দশবার খায়, সেই 'দুধের ছাওয়াল' কি

করে গোষ্ঠে যাবে ? পথে তৃণাঙ্কুর, ছেলের নধর কোমল পায়ে কাঁটা ফুটবে, মাঠে গোরু চরাতে গিয়ে প্রখর রৌদ্রে ননীর পুতুল ছেলে গলেই যাবে। তাছাড়া, যে ছেলে আঙিনার বাইরে যায় না, মা যাকে কোলে করে থাকলেও চমকে ওঠে—তাকে গোষ্ঠে পাঠিয়ে মা কেমন করে ঘরে নিশ্চিন্ত থাকবেন ?

এদিকে রাখাল-বেশে সজ্জিত হয়ে আসেন শ্রীদাম, সুদাম, বসুদামাদি সখা। আসেন জ্যেষ্ঠ বলরাম। তারা 'ভায়্যা ভায়্যা' বলে ডাক দিতেই কৃষ্ণ মায়ের কাছে আবদার তোলেন, 'ওগো মা, আজি আমি চরাব বাছুর।' কিন্তু—'গোপালের কথা শুনি সজল নয়নে রানী অচেতনে ধরণী লোটায়।'

আবেগ-বিহ্বল স্নেহাতিশয্যের এইখানেই শেষ নয়। বলরামের আশ্বাসবাক্যে তিনি খানিকটা ধৈর্য ধরে কৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠাতে স্বীকৃত হন এবং ছেলেকে রাখাল বেশে সাজাতে বসেন। কিন্তু বেশ রচনা করতে গিয়ে মায়ের হাত কাঁপে, আঁখিনীরে বসন ভিজে যায়—

> "বান্ধিতে বিনোদ চূড়া নিরখিতে কেশ।
> আঁখিযুগ ঝরঝর না হইল বেশ॥
> পরাইতে নারে রানী রঙ্গ পীত ধড়া।
> ক্ষীণ-মাজা দেখি ভয়ে ভাঙ্গি পড়ে পারা॥
> পরাইতে নূপুর কোমল সে চরণ।
> নারিনু বিদায় দিতে বলে ঘন ঘন॥"

তবু বিদায় দিতে হয়েছে। বিদায় দিতে গিয়েও ছেলেকে শতবার মাথার দিব্য দিয়ে বলেছেন, 'আমার শপতি লাগে, না ধাইও ধেনুর আগে, পরাণের পরাণ নীলমণি।' আরও বলেছেন, বলাই যেন যায় সকলের আগে, অন্যান্য বালকেরা যেন থাকে বামভাগে, আর শ্রীদাম-

সুদাম যেন থাকে পিছনে। অন্যান্য বালকের রক্ষাকবচে আবৃত হয়ে বালকব্যূহের সুরক্ষিত স্থানে থাকবে নিজের ছেলেটি—

'বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম-সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে যাইও সঙ্গছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥'

এসব ক্ষেত্রে মায়ের স্নেহান্ধতা চরমে উঠেছে। নিজের ছেলের প্রতি মমতাধিক্যে মা যশোদা পরের ছেলের বিপদের কথা ভুলে গেছেন।

বিদায়ক্ষণের চিত্রটি আরও করুণ। গোষ্ঠে যেতে যেতেও যশোমতী বারবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে কৃষ্ণের মুখ দেখেছেন, শেষবারের মত ছেলের মুখে মধুর 'মা' ডাকটি শুনতে চেয়েছেন, করুণ কণ্ঠে বলেছেন—

বাছা, রয়্য রয়্য রয়্য রে।
নেহারি বয়ান, ভরিয়া নয়ান
তবে তুমি ছাড়্যা জায়্য রে॥

এই যেমন পূর্ব গোষ্ঠে মাতা যশোমতীর চিত্র, বিরহ-বাৎসল্যের একশেষ, তেমনই উত্তর গোষ্ঠে মায়ের মিলন-বাৎসল্যের ছবি। সাময়িক বিচ্ছেদের পর প্রাণের ধনকে কাছে পেয়ে উৎকণ্ঠিতা জননীর স্বস্তি ও তৃপ্তির চিত্র। সারা দিনমান গোষ্ঠে কাটিয়ে বেলা অবসানে গো-পাল ও সখাগণের সঙ্গে গোপাল গোকুলে ফিরে আসেন। রত্ন-প্রদীপে ছেলেকে বরণ করে মাতা আঁচল দিয়ে হাত-মুখ মুছিয়ে গভীর সোহাগে পুত্রের মুখ চুম্বন করেন। তখনও মায়ের মুখে আক্ষেপ, 'এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল।' গোষ্ঠে ছেলের কষ্টের কথা স্মরণ করেও কত না ক্ষোভ—

ক্ষীর সর ননী দিলাম
আঁচলে বান্ধিয়া।

বুঝি কিছু খাও নাই
স্থখাঞেছে হিয়া ॥
মলিন হৈয়াছে মুখ
রবির কিরণে।
না জানি ভ্রমিলা কোন্
গহন কাননে ॥

বাঙালী কবির কলমে আঁকা যশোমতীর এই বাৎসল্য চিত্র কিছুটা আতিশয্যে পূর্ণ। সত্য বটে বাঙালী মায়েরা স্নেহকাতর। অন্ধ আবেগে তাঁরা কারণে-অকারণে শঙ্কাতুর। সন্তানকে স্নেহাঞ্চলে বেঁধে রাখাই তাঁদের স্বভাব। তবু যশোদা যেন সীমা অতিক্রম করেছেন। কেউ কেউ তাই অভিযোগ করে বলেছেন, পদাবলীর মা যশোদা ঠিক বাস্তব নন, তাঁর বাৎসল্য অনেকটা 'পোশাকী'। কারণ, নন্দব্রজ থেকে গোষ্ঠভূমি দূরে নয়, কৃষ্ণ একাও যাবেন না, তবু মায়ের উৎকট আশঙ্কা ও উদ্বেগ। বাস্তবে যেন বাংলার ঘরে এ ছবি দেখা যায় না।

কিন্তু যশোমতীর মমতাধিক্যের এই চিত্রাঙ্কনের অন্য গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। যশোদার বাৎসল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধ্য। যে স্থগভীর তন্ময় মাতৃস্নেহ বিশ্বরঞ্জন ভগবান কৃষ্ণকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধে, নন্দরানী সেই স্নেহের পূর্ণ প্রতিমা। বৈষ্ণব কবিগণ তাই এই মাতৃ বিভাব রচনায়—অশ্রু, পুলক, গদ্‌গদভাষ ও স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিকাশ দেখিয়েছেন। অবস্থা বিশেষে বিষাদ, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, ঔৎস্থক্যাদি ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে সেই বাৎসল্যকে স্বাদ্য করে তুলেছেন। ফলে যে প্রভাতরল জ্যোতি ঠিক বস্থধাতল থেকে উত্থিত হয় না, সেই স্বর্গীয় জ্যোতিতে যশোমতী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। বাস্তব জননী থেকে তাই তিনি হয়েছেন স্বতন্ত্র। ভাবের আতিশয্য এ মাকে পৃথক মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

শাক্তগীতির জননী মেনকা

শাক্তগীতির মা মেনকা, আর এক ভাবের জননী-মূর্তি। স্নেহসোহাগে তিনি সজল, উচ্ছল অথচ বাস্তব। তিমিরঘন রজনীতে বর্ষণমুখর বর্ষার অবিশ্রান্ত ক্রন্দন যিনি কান পেতে শুনেছেন, তিনি এ মেনকার মর্মবেদনা অনুধাবন করতে পারবেন।

সাধারণত মাতৃস্নেহের উৎসার দুটি পক্ষকে ঘিরে—পুত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষ। যশোমতী তনয়-স্নেহে তন্ময়, মেনকা তনয়া-স্নেহে উন্মাদিনী। এদেশে সামাজিক কারণে কন্যাজন্ম দুঃখজনক হলেও জননীর মমত্বে পুত্রে ও কন্যায় তারতম্য নাই। তবু মায়ের টান কন্যার দিকেই যেন পাল্লায় ভারী। কন্যাসন্তানকে কেন্দ্র করে মাতৃস্নেহ কতটা উত্তাল হতে পারে, বাংলার 'আগমনী' ও 'বিজয়া' সঙ্গীত তার সাক্ষ্য। এই বাৎসল্যের আশ্রয়বিভাব মা মেনকা।

মেনকা পৌরাণিক চরিত্র। তিনি পিতৃগণের মানসী কন্যা, নগাধিরাজ হিমালয়ের গৃহিণী জগজ্জননী উমার জননী। বিভিন্ন পুরাণে মেনকার বাৎসল্যের চিত্র আঁকা হয়েছে। পার্বতীর জন্মকাল থেকে বিবাহকাল পর্যন্ত এই বাৎসল্যের প্রসার। এরই ভিতর চিত্রিত হয়েছে বালিকা কন্যাকে ঘিরে জননীর স্নেহ-সিন্ধুর স্ফীতি, বিবাহ-যোগ্যা কন্যার চিন্তায় উদ্বেজিতা মাতার উদ্বেগ এবং কন্যাকে যোগ্য-পাত্রে সমর্পিতা হতে দেখে মায়ের সুখতৃপ্ত হৃদয়ের উল্লাস।

বাংলার শাক্ত সঙ্গীতের মা মেনকার প্রকাশ উমা-বিবাহের পরে। বাল্য বাৎসল্যের আনন্দ-কলরব সূচিত হতে না হতেই পতিগৃহগতা দুহিতার জন্য এ-মায়ের বিচ্ছেদ-ক্রন্দন শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে। পৌরাণিক মেনকা-চিত্রের যেখানে সমাপ্তি, বাংলার মেনকার আসল-

সূচনা সেইখানে। একটি আর একটির পরিপূরক হলেও, পার্থক্যও গুরুতর। কিশোরী কন্যাকে নিয়ে মায়ের যে স্নেহচাঞ্চল্য, বিবাহিতা কন্যার জন্য সে স্নেহ চঞ্চলতা নয়। এখানে তনয়া বিশ্লেষজনিত বেদনার হেতু স্বতন্ত্র, উদ্বেগের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। আবেগের-উচ্ছ্বাসে, চিন্তায়-ব্যাকুলতায়, অনুযোগে ক্রন্দনে শাক্তগীতির মেনকা সেই জননী চিত্র। এদেশের বিশেষ সামাজিক পরিবেশে তনয়া-বিশ্লিষ্টা মাকে যিনি চোখ মেলে দেখেছেন, তিনি এ মেনকাকে দেখেই চিনতে পারবেন।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, 'বঙ্গদেশের কতকগুলি গভীর প্রাণের কামনা ছিল, শিশুকন্যার পিতৃগৃহ গমন, দুধের মেয়ে অষ্টমবর্ষে গৌরী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইত···মায়ের রাত্রিও সুখে প্রভাত হইত না,—ক্রোড়ের শিশু-ছাড়া মা স্বপ্ন দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিতেন।' আগমনী গানে পতিগৃহবাসিনী কন্যার জন্য বাঙালী মায়ের এই কান্নাই মেনকার চোখে কোটালের সাগর হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে ভক্তহৃদয়ের গভীর আকুতি মিশ্রিত হওয়ায় এ অশ্রু যেন আরও বাস্তব, আরও মর্মস্রাবী হয়ে উঠেছে।

বিবাহিতা উমা বৎসরান্তে শরৎকালে মাত্র তিন দিনের জন্য মায়ের কাছে আসেন। এই আসার দিনগুলির জন্য মেনকার অধীর প্রতীক্ষা। এই প্রতীক্ষার সঙ্গে জড়িত এদেশের মায়েদের ভয় ও দারুণ হতাশার একটি বেদনা। শঙ্কা এজন্য—মেয়ে পরের ঘরে গিয়ে মানিয়ে চলতে পেরেছে কি না। মায়েদের কামনা, মেয়ে পতিগৃহে গিয়ে সুখী হোক, অসপত্ন ভোগে সৌভাগ্যবতী হোক। তাকে যেন দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করতে না হয়। কিন্তু হায়, দরিদ্র এই দেশে মায়েদের সে আশাভঙ্গ হয় প্রতি পদে। মেনকারও তাই হয়েছে। প্রাকৃত জননীবুদ্ধিতে তিনি শুনেছেন, জামাতা শিব বিত্তহীন, ভিখারী। উপরন্তু উমাকে সতীন নিয়ে ঘর করতে হয়। শুনে 'দাবাগ্নি হরিণী'র

মত মেনকা উতলা হয়ে উঠেছেন। দিনে অস্থির ভাবনা, রাত্রে দুঃস্বপ্নের চমক—

বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ ;
হেমাঙ্গী হয়েছে কালীর বরণ।
হেরে তার আকার চিনে উঠা ভার
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।

তাই শরৎকাল এলেই মায়ের বেদনা অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। মেঘমুক্ত সুনীল আকাশে চাঁদ দেখা দেয়, সরোবরে ফুটে ওঠে শতদল, গাছে গাছে হলুদবৃন্ত শুভ্র শেফালিকা। চাঁদ, পদ্ম, শেফালীর উপমেয় উমা কোথায়? মেনকা বেদনায় ভেঙ্গে পড়েন—

গিরি, গৌরী আমার এল কৈ !
ঐ যে, সবাই এসে দাঁড়ায়েছে হেসে
(শুধু) সুধামুখী
আমার প্রাণের উমা নেই।

এই নিয়েই স্বামীর কাছে অনুরোধ, অনুযোগ ও অনুলাপঃ 'যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী', 'কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীকে আনিতে ?' 'এমন মেয়ে কারে দিয়ে হয়েছ পাষাণ', 'মা হতে বুঝিতে চিতে', 'প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে।'

বিবাহিতা কন্যাকে গৃহে আনার ব্যাপারে এই পতি-পত্নী সংবাদ বাঙালী মায়ের অন্তরবেদনাকে অবারিত করেছেঃ সে বেদনা বৃষ্টি-স্পৃষ্ট সাগর তরঙ্গের মত স্ফীত, শ্বসিত, কল্লোলিত। তার আবেগ জোয়ারে উচ্ছ্বসিত ঊর্মির মত উত্তাল ও বেগবতী।

মায়ের এই ব্যাকুলতায় পাষাণ-দৃঢ় পতিকে বিচলিত হতে হয়। তাঁকে কৈলাসে যেতে হয়। মায়ের টানে মেয়েও উতল। এ যে

রক্তের টান—অলক্ষ্য অথচ অমোঘ। ‘মায়ের ছলছল দুটি আঁখি’ স্মরণ করে মা-পাগল মেয়ে অস্থির হয়ে মায়ের কাছে আসেন। মাতৃস্নেহের এই এক ক্ষমতা ; তা নিজে বিগলিত হয়, সন্তানকেও বিগলিত করে।

মাতা ও কন্যার মিলন দৃশ্য মাতৃহৃদয়ের ঔৎসুক্য, উৎকণ্ঠা ও আনন্দে সুন্দর-মধুর। মেনকা ‘তৃষিত চাতকী’র মত পথ পানে চেয়েই ছিলেন। উমা আসার খবর পেয়ে তিনি উন্মাদিনীর মত বাইরে ছুটে আসেন। তাঁর চরণ গতি-চঞ্চল, বেশ অসম্বৃত, স্রস্ত কুন্তল-ভার। রথ থেকে নামতেই তিনি মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। হর্ষ অশ্রু জড়তায় সে এক অদ্ভুত স্বপ্নাবেশ : ‘গদ গদ ভাব ভরে ঝরঝর আঁখি ঝরে।’

মিলনের প্রথম আবেগ কেটে গেলে আসে স্পষ্ট ভাষা। মায়ের মনে কত কথা জমে আছে, মা বলে যেন শেষ করতে পারেন না। প্রথম জানবার কথা—‘কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই।’ বাঙালী মায়ের সমগ্র উৎকণ্ঠা এই প্রশ্নে বিগ্রহবান্। বাংলার ‘আগমনী’ গান মাতৃহৃদয়ের এই উৎকণ্ঠারই প্রাণময় সঙ্গীত।

মেয়ের সঙ্গে মিলন মাত্র তিন দিনের—সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী। এই তিন দিন মায়ের কাছে থেকে, দশমীর দিন উমা আবার পতি-গৃহে ফিরে যান। উমার বিদায়জনিত গানগুলি ‘বিজয়া’ নামে পরিচিত। স্নেহের দুলালীর বিজয়া মায়ের কোমল প্রাণে শেলের মত বাজে। উতল কান্নায় মা ভেঙে পড়েন। নবমীর রাত্রি থেকেই বিজয়ার করুণ সুর বেজে ওঠে। রাত্রি-প্রভাতে ‘দুখিনীর ধন’ মায়ের ঘর শূন্য করে চলে যাবে। নবমী নিশি যাতে না পোহায়, তার জন্য মায়ের আর্ত মিনতি। জড়ে ও চেতনে ভেদাভেদ ভুলে তিনি রাত্রিকে প্রাণময়ী মনে করে বলে ওঠেন, ‘ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান।’ কিন্তু নিষ্ঠুর প্রকৃতি মায়ের মিনতি শোনে না। রজনী

প্রভাত হয়। দ্বারে মহাদেবের ডম্বরু ধ্বনি শোনা যায়। মা একবার জয়াকে বলেন, 'জয়া, বল্ গো পাঠানো হবে না'; আবার পরক্ষণেই স্বামীকে বলেন, 'গিরি, যায় যে হর লয়ে প্রাণ-কন্যা গিরিজায়।' তবু বিদায় দিতে হয়। মেয়ের চিবুক স্পর্শ করে চুম্বন করে বিদায় দিতে গিয়েও বলতে থাকেন, 'ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি।'

উমা যাত্রা করেন। পিছনে পড়ে থাকে আবেগ-কম্পিত, অশ্রুসজল, 'মণিহারা ফণী'র মত বিরহ-খিন্ন মাতৃ-হৃদয়।

মেনকার বাৎসল্যও আবেগে উচ্ছ্বাসে আতিশয্যে ভরা। তবু বাংলার সামাজিক পরিবেশে এগুলিকে কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। বঙ্গজননী স্বভাবত আবেগময়ী। উপরন্তু কন্যা-সন্তানের প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা আছে। মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাতে হবে বলে মাতৃস্নেহ যেন এক্ষেত্রে প্রথম থেকেই উদ্বেগ পোষণ করতে থাকে। পরের গৃহে গিয়ে মেয়ে সুখী হবে কি না, মানিয়ে চলতে পারবে কি না, তার জন্যও একটি আশঙ্কা স্রোতস্বিনীর অন্তরে ফল্গু আবর্তের মত প্রবাহিত হতে থাকে। কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাতে গিয়ে সেই ফল্গুধারা সহস্রধারায় বাইরে উচ্ছ্বসিত হয়। দ্বিতীয়ত, কন্যাসন্তানকে বিদায় দিতে গিয়ে মায়েরা যে বিশ্লেষার্তি ভোগ করেন তার দৃশ্য প্রত্যক্ষ। হাজার বছর আগে গৌড়বঙ্গের একজন সংস্কৃত কবি বলেছিলেন, কন্যার পতিগৃহ গমনে মায়ের অশ্রু যাত্রাপথকে পিচ্ছিল করে তোলে। এখনও তার ব্যতিক্রম নাই। বাসী বিবাহের দিনে যাত্রাকালে মায়ের সে বেদনার ছবি সকলেই চোখে দেখে থাকেন। 'বিজয়া' সঙ্গীতে মেনকার বিয়োগার্তি সেই বেদনার প্রতিলিপি মাত্র। শাক্তগীতির কবিগণ নিজের চোখে দেখেই এই বাস্তব মাতৃচিত্র অঙ্কন করেছেন।

বাঙালী মায়েরা আবেগের কলোচ্ছ্বাস হলেও লোক-লৌকিকতার জ্ঞানে ধীর বুদ্ধির আশ্রয়। আবেগের মুহূর্তেও তাঁদের ধীর কর্তব্যবুদ্ধি

ও দূরদর্শিতা বিস্ময় সৃষ্টি করে। এ যেন স্থির বিদ্যুতের দীপ্তি, বর্ষোৎপলের কোমল কাঠিন্য। বঙ্গের প্রসূতি মাত্রেই প্রৌঢ়া গৃহিণী। শাক্তগীতির মা মেনকা সেই গৃহিণীপনার প্রতিমূর্তি। তিনি জানেন, পুরুষের লোক-লৌকিকতা জ্ঞান অল্প। স্বামীকে তাই তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, 'আছে কন্যা সন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়,' 'গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।' আবার উমার যাত্রাকালে নিজের অসম্বৃত আবেগের মুখেও বলতে ভোলেন না—

'এস মা, এস মা উমা, বলো না আর যাই যাই।
মায়ের কাছে হৈমবতী, ও কথা মা বলতে নাই।'

শুধু তাই নয়, মেনকার কতকগুলি উক্তি গভীর মনোবিশ্লেষণের সূত্রে বিধৃত। বাঙালী মায়ের অন্তর্দৃষ্টি রঞ্জন রশ্মির মত। সে দৃষ্টি সন্তানের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে তার অলক্ষ্য মনের ছবিটি পর্যন্ত তুলে নেয়। মেনকাও মেয়ের পতিগৃহের তথ্যসংগ্রহে সেই অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার আঁতের কথা টেনে বের করেছেন।

বঙ্গজননী শুধু আবেগের অশ্রুময়ী প্রতিমা নন। তাঁরা সাংসারিক জ্ঞানের ভাণ্ডার, প্রত্যয়ে অবিচল, কর্তব্যে দৃঢ়নিষ্ঠ। তাঁদের গৃহিণীপনায় প্রচুর অপচয় থাকলেও সঞ্চয়ের অভাব নাই।

শ চী মা তা

ষোড়শ শতকের প্রথম দশকের শেষের দিকে বঙ্গঘরের একখানি চিত্র : একজন দীপ্ত গৌর জ্যোতির্ময় যুবা পুরুষ নিবিড় কৃষ্ণাবেশে অদ্ভুত নৃত্য করছেন। তাঁর চোখে গঙ্গা-যমুনার জলধারা, দেহে রোমাঞ্চ-স্বেদ। এই কম্প, এই জড়ভাব। তিনি ক্ষণে হুঙ্কার-গর্জন করছেন, ক্ষণে গদগদভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে—

'বোল বোল বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভারতরঙ্গ প্রবল॥'

ইনি বাংলার প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি নিজে অঝোর ধারায় কেঁদেছিলেন, অপর সকলকে কাঁদিয়েছিলেন। আর এই প্রেমের ঠাকুরের জন্য বিগলিত বাৎসল্যে যিনি সবচেয়ে বেশি কেঁদেছিলেন, তিনি গৌরাঙ্গজননী শচীমাতা।

শচীমাতা চিরদুঃখিনী বঙ্গজননীর আর এক ভাবের মূর্তি। তাঁর দুঃখ দারিদ্র্যভারে প্রপীড়িতা প্রসূতির দুঃখ নয়, অজাত-মৃত-মূর্খ পুত্রের দুঃখও নয়। তাঁর দুঃখ পুত্র-সন্ন্যাসের দুঃখ। যে পুত্র পণ্ডিত হয়েও উদাসীন, জীবিত থেকেও গৃহত্যাগী, সে পুত্রের মায়ের অশ্রু-আবেগের শেষ কোথায়? আউল-বাউল যোগী দরবেশের এই দেশে এই অশ্রু যে কত মায়ের নিত্যসঙ্গী, তার সংখ্যা করা কঠিন। শচীদেবী সেই সকল সন্ন্যাসী-জননীর একটি পূর্ণাঙ্গ সজল আলেখ্য। সবচেয়ে বেশি পেয়েও তিনি সর্বরিক্তা।

শচীমাতার ভিতর পুত্রস্নেহে দুর্বল, শশঙ্ক ও একান্ত আত্মলুপ্ত মায়ের ভাবটি অতি স্পষ্ট। পর পর তাঁর আটটি কন্যা সন্তান হয়। কোনটাই বাঁচে না। এর পর বিশ্বরূপের জন্ম। তারও অনেক দিন

পরে শচীদুলাল গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। গৌরাঙ্গের কৌলিক নাম বিশ্বম্ভর। আর এক নাম নিমাই। নিমের মত তেঁতো মনে করে ডাকিনী-শাকিনী অপদেবতা ও যম যাতে তাঁকে দর্শন না করে, এই লক্ষ্যেই ছেলের নাম নিমাই। এই নামকরণের ভিতর অপার বাৎসল্যময়ী মায়ের সদাভীত শঙ্কার প্রকাশ। তাই এই ছেলের জন্মমাত্র মমতার আতিশয্য মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। মাতা নবজাতককে আদর করে 'চাঁদা চাঁদা' ছড়া শোনান, শিশুর হাত ধরে 'হাঁটি হাঁটি পায় পায়' বলেন। কখনও বা মায়ে-পোয়ে লুকোচুরি খেলা—

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে, বিশ্বম্ভর, আমি না দেখিনু ॥

ক্রমে 'ক্ষেপার শিরোমণি' নিমাই দুরন্ত হয়ে ওঠেন। পরের ঘরে তিনি দ্রব্য চুরি করে খান, পাড়ায় ছেলেদের ধরে মারেন। নিষেধ করলে ক্রুদ্ধ হয়ে ঘরের জিনিস ভেঙে একাকার করেন। আরও বড় হলে কৈশোর-চাপল্য ঘর-পাড়া ছেড়ে গঙ্গার ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি কারও গায়ে জল ছিটিয়ে দেন, কারও গায়ে 'কুল্লোল'। কোন নারীর চুলে জড়িয়ে দেন 'ওকরার ফল', কারও বা ছড়িয়ে ফেলেন ব্রতের উপচার। সকলে অভিযোগ করেন। কিন্তু 'শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভু জননী।' মিষ্টি কথায় শান্ত করে তিনি সকলকে বিদায় দেন। সোনার চাঁদ ছেলেকে তবু তিনি রূঢ় কথা বলতে পারেন না।

শচীদেবীর এই প্রশ্রয়ে অন্ধিনী মায়ের স্নেহের দৌর্বল্য প্রকট হলেও, এর সঙ্গে মৃতবৎসা জননীর বেদনাকে যুক্ত করে দেখতে হবে। শচীর বাৎসল্য মরা গাঙে বর্ষার বান, স্তিমিতপ্রায় দীপে নবস্নেহের নিষেক। তাই ছেলের দুরন্তপনা তাঁর কাছে 'ক্ষেপামি', পুত্রের

'আখুটি' (বায়না) তাঁর কাছে কৌতুক। উপদ্রবসহনে তিনি সর্বংসহা ধরণী।

এই স্নেহ আরও উতল হয়েছে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে। বিশ্বরূপ শৈশব থেকেই সংসার-বিরক্ত। তিনি ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা নিয়েই থাকতেন। বৈষ্ণবপ্রধান অদ্বৈত 'গোসাঞি'র সঙ্গে চলত তাঁর শাস্ত্র-বিচার। মায়ের ইচ্ছা বিশ্বরূপকে বিবাহ দেন। আয়োজন-উদ্যোগ প্রায় সমাপ্ত, এমন সময় বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করলেন। মায়ের বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে আরও নিবিড় করে আঁকড়ে ধরেন নিমাইকে। যেন যক্ষিনীর ধন।

বিশ্বরূপের সংসারত্যাগের পর সন্ত্রস্ত পিতা জগন্নাথ মিশ্র বালক নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ করে দেন। পাছে এ ছেলেও সন্ন্যাস নেয়—এই ভয়। শচীদেবী বলেন, মূর্খ হলে চলবে কেন? 'মূর্খেরে ত কন্যাও না দিবে কোনজনে।' শেষ পর্যন্ত জয়ী হল পিতার মত—'পড়িয়া নাহিক কার্য।' এর ফল হল বিপরীত। নিমাইর ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে গেল। তিনি অধিক রাত্রেও ঘরে ফেরেন না, কারও বাগান নষ্ট করেন, কখনও বা পরিত্যক্ত আস্তাকুঁড়ে 'বর্জ্য হাঁড়ির আসনে' বসে থাকেন। মা হায় হায় করে ওঠেন। ছেলের সোনার অঙ্গে হাঁড়ির কালি, তা ছাড়া স্থানটি অশুচি। তিনি বোঝেন, এ কাজ ছেলের মূর্খতার ফল। স্বামীকে তিনি বোঝান। মায়ের আগ্রহাতিশয্যেই আবার নিমাইয়ের পড়ার ব্যবস্থা হয়।

এর মধ্যে স্বামী মিশ্র দেহরক্ষা করলেন। একে প্রথম পুত্রের সন্ন্যাস, অপরদিকে পতির বিয়োগ। দুই শোকে মুহ্যমান শচীদেবী। তবু যে তিনি ধৈর্য ধরতে পারলেন, তার কারণ বাৎসল্য—'দুর্নিবার গৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।' বাৎসল্য যে সঞ্জীবনী সুধা। এ সুধা শুধু সন্তানকে সঞ্জীবিত করে না, জননীকে দেয় অপার দুঃখসহন ক্ষমতা। শচীমাতা যে 'ধৈর্যে পাষাণসম, সহ্যগুণে পৃথিবী'—এর কারণ বাৎসল্য।

মায়ের সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হল সে পুত্রের সেবায়। পিতৃহীন বালকের পরিচর্যা ভিন্ন শচীমাতার অন্য কাজ নাই। নিমাই হল তাঁর চোখের মণি—

দণ্ডেকে না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্ছা পায়্যা আই দুই চক্ষে হয় অন্ধ॥

শুধু তাই নয়, পুত্রস্নেহেও তিনি হলেন অন্ধ।

'ঘরে দরিদ্রতা'র প্রকাশ, অথচ ছেলের মেজাজ মহামহেশ্বরের মত। কোন দ্রব্য চেয়ে না পেলেই নিমাই উদ্ধত হয়ে ওঠেন। একদিন স্নানের সময় চেয়েছেন 'তৈল আমলকি' 'দিব্য মালা আর সুগন্ধি চন্দন'। ঘরে মালা নাই। 'মালা আনো গিয়া' বলতেই নিমাইর রুদ্র মূর্তি। ক্রোধবশে হাতে ঠেঙা নিয়ে মুহূর্তে সমস্ত সঞ্চয় ভেঙে ফেললেন, শিকা টেনে মাটিতে ছড়িয়ে ফেললেন ধান, চাল, কাপাস, মুগের বড়ি। মা সন্ত্রস্ত, স্তব্ধ। এত অপচয়েও তাঁর নির্বাক ধীরতা।

'গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া।
মহাভয়ে আছেন যে হেন লুকাইয়া॥'

একি শুধু প্রশ্রয়? —এ হল মায়ের ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষা। এই মা-ই আবার শান্ত মুহূর্তে ছেলেকে বোঝাতেন, 'এত অপচয় বাপ্ কি কার্যে করিলা?'

ক্রমে নিমাই বড় হলেন, বিদ্যারসে বিভোর হলেন, হলেন পণ্ডিত। ষোড়শ বর্ষে প্রথম যৌবনে মদন-মোহন গৌরাঙ্গ। মাতৃস্নেহ অন্যদিকে সার্থকতা খোঁজে—'বিবাহের কার্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ।' প্রথম বিবাহ হল বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে। অনেকেই মনে করেন, এ বিবাহ কুমার-কুমারীর 'সাহজিক প্রীতি'র ফল। শচীমাতা সেকথা

প্রথমে না জেনে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও পরে সমর্থন করলেন। সে যুগের মায়ের ক্ষেত্রে এ এক অভিনব দৃষ্টান্ত।

'শ্রীশচী সুখের নাহি পার !
পুত্রমুখ বধূমুখ দেখে বারবার ॥'

কিন্তু মায়ের এ সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। নিমাইয়ের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ কালে বিরহ-সর্পদষ্ট হয়ে লক্ষ্মী দেবী দেহত্যাগ করলেন। শচীমাতার 'দুঃখরস' অবর্ণনীয়। তাঁর ক্রন্দনে কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবীভূত হল। নিমাই ফিরে এলেন। অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন মাতা। নিমাই তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। নিজে তন্ময় হলেন বিদ্যাচর্চায়। কিন্তু মা ? তাঁর মন পুত্রের পুনর্বিবাহে—'পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে।' এবার মায়ের নির্বাচনেই বিবাহ হল। বধূ হলেন নবদ্বীপের 'রাজপণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া।' মা মহারঙ্গে পতিব্রতা এয়ো নিয়ে স্ত্রীআচার করলেন, পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ চুম্বন করে নববধূকে ঘরে তুললেন।

শচীমাতার এ সুখও মেঘের ফাঁকে ক্ষণিক বিদ্যুৎ চমকের মত। শচীদেবী চিরদুঃখিনী মাতৃমূর্তি। দুঃখ আশঙ্কা উদ্বেগ তাঁর নিত্য সহচর। পিতৃকৃত্য করতে গিয়ে নিমাই গয়া থেকে ফিরে এলেন অপূর্ব ভাবাবেশ নিয়ে। দুই কমল নয়নে অঝোর ঝর্ণা প্রবাহ, নিরন্তর ব্যাকুলতা ও দীর্ঘশ্বাস। মা এ ভাবাবিষ্টতার মর্ম বুঝতে পারেন না। তিনি সভয়ে গঙ্গাপূজা করেন, বধূকে এনে পুত্রের পাশে বসান, ছেলেকে প্রশ্ন করেন, 'আজি বাপ্ কি পুঁথি পড়িলা ?' পুত্রের উত্তর, 'পড়িলাম কৃষ্ণ নাম।'

ক্রমে মত্ততা বৃদ্ধি পায়। 'ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্ছা পায়।' কখনও বা আপন মনে কথা বলতে থাকেন। সকলে বলে, বায়ুর প্রকোপ, ছেলেকে ঘরে বেঁধে রাখ, ডাব-নারিকেল জল

খাওয়াও, শিবাঘৃত প্রয়োগ কর।' মাও ভাবেন 'বায়ুর প্রকোপ।' শ্রীবাস বলেন, 'বায়ু নয়, মহা ভক্তির যোগ।' শুনে শঙ্কিতা হন জননী—'বাহিরায় পুত্র পাছে—এই মনে ভয়।'

এই সূত্রেই শচীমাতার 'বৈষ্ণবাপরাধ'। তাঁর ধারণা, অদ্বৈত মহাপ্রভুর সঙ্গ করার ফলেই বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী হয়েছে, নিমাইও বুঝি তাঁর প্ররোচনায় গৃহত্যাগ করে। দুঃখদীর্ণ জননী আক্ষেপ করে বলেন, 'কে বলে অদ্বৈত—দ্বৈত বড় এ গোসাঞি।' বৈষ্ণবের সূক্ষ্ম বিচারে এ অপরাধ। কিন্তু প্রকৃত বিচারে এইখানেই শচীদেবীর খাঁটি মাতৃত্ব। কোন্ মা প্রাণ ধরে চান, ছেলে সংসারবিরাগী হোক। সন্তানের গৌরব মায়ের কাম্য, কিন্তু সে কামনা অপত্য-বিচ্ছেদের বিনিময়ে নয়।

শ্রীবাসের গৃহ উচ্চ কীর্তন রোলে ভরে যায়। উন্মত্ত ভাবাবেশে নিমাই নৃত্য করেন। বৈষ্ণবগণ তাঁকে অভিনন্দিত করেন। কিন্তু, 'ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা। রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা॥' —নিমাই উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে ভূমিতে আছাড় খেয়ে পড়েন, কোমল শরীরে সে আছাড় 'দেখে গোবিন্দ স্মরয়ে আই বুজি দুই আঁখি।' কখনও ভাবাবেগে বলে ওঠেন 'ধর, ধর, আমার নিমায়ে ধর।' প্রচারিত হয়—নিমাই ঈশ্বর। মা শুনে গর্বে ভরে ওঠেন, কিন্তু অন্তরে ভয়—'বাহিরায় পুত্র পাছে।' একদিকে গর্ব, অন্যদিকে উদ্বেগ—একদিকে আনন্দ, অপরদিকে আতঙ্ক। শচীমাতার বাৎসল্য যেন তুফান নদীর তরঙ্গ দোল।

শেষ পর্যন্ত সত্য হল মায়ের আশঙ্কা। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন বলেই স্থির হল। কথাটা মায়ের কানে উঠতেই—'মূর্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।' জ্ঞান ফিরে এলে কোনো ভূমিকা না করে তিনি হাহাকার করে উঠলেন 'না যাইয় না যাইয় বাপ, আমারে ছাড়িয়া'—

'প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ,
অনাথিনী ছাড়িতে না জুয়ায়।'

নিমাই-সন্ন্যাসে শচীমাতার বেদনার অশ্রুময় কাহিনী, চৈতন্য-জীবনী ও গৌরাঙ্গ পদাবলীতে অশ্রুর লহর হয়ে আছে। ব্যর্থ হয়েছে মায়ের মিনতি। শাস্ত্র বাক্যে মাকে আশ্বস্ত করেছেন গৌরাঙ্গ নিজে। কিন্তু এত আশ্বাসেও মাতৃহৃদয় আশ্বস্ত হয় নাই। নিমাই-সন্ন্যাসের পর ভক্তগণ এসে দেখেছেন, দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছেন স্তব্ধ এক মাতৃমূর্তি।

জড়প্রায় আই কিছু, না স্ফুরে উত্তর।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর॥

উত্তর শচী-চরিত্রের মুখ্য বৈশিষ্ট্য এই জড়প্রায় স্তব্ধতার করুণা। যেন 'কৃত্রিম পুত্তলী।' বাহ্যজ্ঞানশূন্যা অশ্রুময়ী, ভাবতন্ময়। পুত্র-বিরহে দুঃখ দীর্ণ জননীর 'দিব্যোন্মাদ' অবস্থা। নিমাই সন্ন্যাসের পর যতবার শচীদেবীকে চোখের সামনে আনা হয়েছে, 'ততবার এই একই মূর্তি।' কৃষ্ণবিরহে যশোদার মত 'পরমবিহ্বল।' চোখে প্রেমজলের ধারা, মুখে প্রশ্ন, তোমরা কি মথুরা থেকে এসেছ? 'কহ কহ রামকৃষ্ণ আছেন কেমনে?' বলেই মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কখনও বা বলে ওঠেন, ওই শুনি শিঙ্গা বাজে? তবে কি অক্রুর গোকুলে এল? — অমনই বিরহ-বিহ্বলতায় বাহ্যজ্ঞানহীন —

কখনো বা উচ্চ করি করেন ক্রন্দন।
সংসার দ্রবয়ে তাহা করিলে শ্রবণ॥
অবিচ্ছিন্ন ধারা দুই নয়নেতে ঝরে।
সে কাকু শুনিতে কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে॥
কখনো বা ধ্যানে কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার করি।
অট্ট অট্ট হাসে আই আপনা পাসরি॥

এই দুঃখের মধ্যেও মাকে কখনও কখনও উজ্জ্বল হতে দেখা

গিয়েছে। সন্ন্যাসী পুত্রকে ভোজন করাতে গিয়ে মা বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। ছেলেকে যত্ন করে খাওয়ানো বঙ্গের মায়েদের আর এক বিশেষত্ব। তাতে যে কি গভীর তৃপ্তি, মায়েরাই সে খবর রাখেন। অল্পবিত্ত বাঙালীর ঘরে আহারের উপকরণ সামান্য শাক-পাতা, লাউ, বড়ি, দুধ আর মিষ্টি। কিন্তু মায়ের স্নেহভরা হাতের ছোঁয়ায় সেই সামান্য আহার্য অমৃত হয়ে ওঠে। শচীদেবী ছিলেন রন্ধন-পটিয়সী। যত্নভরা সে রন্ধনের অমৃত স্বাদ নিমাই পেয়েছেন। ছেলেকে ভোজন করিয়ে মায়ের যে সুখ, তাও তিনি মর্মে উপলব্ধি করেছেন। দূর প্রবাসে যাত্রাকালে মাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, মাগো, তোমার রান্না মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন দূরে থেকেও আমি গ্রহণ করব।

শুধু তাই নয়, শচীমাতার স্নেহের ঋণ যে অপরিশোধ্য, সন্ন্যাসী চৈতন্য বার বার সে কথা স্বীকার করেছেন। কোটি জন্মেও সে ঋণ শোধ করা যায় না। সন্ন্যাস গ্রহণকালে তিনি বলেছেন—

ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বারবার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥

সন্ন্যাসী হয়েও মহাপ্রভু এ প্রতিজ্ঞা ভোলেন নাই। নীলাচল থেকে অহরহ মায়ের তত্ত্ব করেছেন। মায়ের কথা মনে করে উদাসীন বিবাগীর অন্তর বেদনা-সজল হয়ে উঠেছে। শচীমাতার বাৎসল্যের এমনই চৌম্বকশক্তি। তা উদাসীনকে উদাসীন থাকতে দেয় নাই। সন্ন্যাসী চৈতন্য বলতে বাধ্য হয়েছেন—

গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥

আরও বলেছেন, তাঁর ভিতর যা কিছু বিষ্ণুভক্তি, তাও এই মায়ের প্রসাদ।

'বঙ্গজননীর স্নেহ কাছেও টানে, আবার উদার প্রেমের মুক্তাঙ্গনে সন্তানকে মুক্তি দেয়। লঘিমা ও মহিমা—বঙ্গমাতার বাৎসল্যের এই দুই সিদ্ধি। বাৎসল্য বশে মা সন্তানের কাছে লঘুতা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না। আবার এই বাৎসল্যই তাঁকে মহিমময়ী বিশ্বজননীর সঙ্গে একাসনে বসায়।'

মঙ্গলকাব্যে জননীমূর্তি

মঙ্গলকাব্যে মা উঠে এলেন উচ্চতর সাহিত্যের পর্যায়ে। পদাবলী ও শাক্ত-গীতিও উচ্চতর সাহিত্য। কিন্তু মা সেখানে বহু বিচিত্র নন। সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগ-আনন্দ মাত্র বৈষ্ণব ও শাক্তসঙ্গীতে দেখানো হয়েছে। হৃদয়ের বহুমুখী প্রকাশ ঘটে ঘটনার বৈচিত্র্যে ও সংঘাতে। সে সংঘাত—সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে জননী-হৃদয়ের দ্বন্দ্ব—বৈষ্ণব সঙ্গীতে তো নাই-ই, শাক্তগীতিতেও তার অভাব আছে। এই দিক থেকে ব্রতকথা, গ্রামগীতিকা প্রভৃতি লোকসাহিত্যের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের জননী মূর্তির সাদৃশ্য আছে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্য সগোত্র। সন্তানের মঙ্গলকামনায় দেবনির্ভরতায় মা ব্রতচারিণী। পরিবেশ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে পল্লীগীতিকার মিল।

লোকসাহিত্যের বহু বিষয় আত্মসাৎ করেই মঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি। তবু মঙ্গলকাব্য ও লোকসাহিত্য এক নয়। গ্রাম-গীতিকার মাতৃমূর্তি গ্রাম্যকবির স্বভাব কবিত্ব ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে আঁকা। গ্রাম-বাংলার মাটির গন্ধে, নদী-নালার রসে সে মূর্তিগুলি প্রত্যক্ষ, মধুর ও রসস্নিগ্ধ। মঙ্গলকাব্যের মা বিদগ্ধ কবি-কল্পনার সৃষ্টি। বাস্তব হলেও কল্পনার হেমদ্যুতিতে তা লোকোত্তর। একটি বনফুল, অপরটি উদ্যানলতা। উপরন্তু মঙ্গলকাব্যের মা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে উত্তীর্ণ এক একটি নাটকীয় চরিত্র। এখানে বাৎসল্য সূর্যরশ্মিপাতে মৃত্তিকাদীর্ণ ভুঁইচাঁপার মত বিকশিত। ব্যাধিনী, ডোমনী, কৃষাণী, রাজরানী, বণিক-পত্নী—সমাজের নানা স্তরের মা মঙ্গলকাব্যে এসে ভিড় করেছেন। আঘাতে-সংঘাতে তাঁরা জলাবর্তে নিক্ষিপ্ত পুষ্পের মত ঘুরপাক খেয়েছেন।

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ কালকেতুর জননী নিদয়া। নিদয়া ব্যাধিনী হলেও শাপভ্রষ্ট দেবতার মর্ত্যজননী। সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এ দৃষ্টান্ত একক। এ দেশের সমাজে ব্যাধ অন্তেবাসী। নিদয়া অন্তেবাসী হয়েও দেবজননীর দুর্লভ সৌভাগ্যে ভাগ্যবতী। মা-পাগল সংস্কারমুক্ত বাঙালী কবির কলমেই জননীর এই মর্যাদার প্রতিষ্ঠা। মাতৃত্বের পংক্তিভোজে বর্ণ-বিচারের স্থান নাই। ব্যাধরমণী নিদয়া সেই সত্যের প্রমাণ। তাঁর সাধ-আহ্লাদ ও মমতাবাৎসল্য বর্ণহিন্দু জননীর সঙ্গে সমসূত্রে গাঁথা। তিনি ধর্মভীরু। দেবদ্বিজে অশেষ ভক্তি। ব্রাহ্মণী-বেশিনী ভগবতীকে তিনি 'পিঁড়ি-পাণী' প্রদান করে পুত্রবর লাভ করেন। সন্তান-সম্ভবা নিদয়ার সাধভক্ষণের চিত্রও সর্বশ্রেণীর জননীর অনুরূপ। কালকেতুর 'বিবাহ-মঙ্গল' অনুষ্ঠানের নিদয়া হিন্দু রমণীরই প্রতিনিধি—'চৌদিগে হুলুধ্বনি দেই ব্যাধ নিতম্বিনী।' শুধু তাই নয়, বধূবরণ অনুষ্ঠানে—

'শিরে দিয়া দূর্বাধান নিছিয়া ফেলিল পান,
নিদয়া দিলেন হুলাহুলি।'

এমন কি উচ্চবর্ণের হিন্দু জননীর মত পুত্র ও পুত্রবধূকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখে নিদয়া তৃপ্ত মনে স্বামীর সঙ্গে কাশীবাসে গিয়েছেন। কেউ বলবেন, ব্যাধজননীর এই কাশীবাসের চিত্র অস্বাভাবিক। দেবজননীর মর্যাদা যিনি পেয়েছেন কাশীবাস কেন, স্বর্গবাসেরও তিনি অধিকারিণী। 'নিদয়ার সফল জীবন'—এই মন্তব্যের ভিতর পরিতৃপ্ত পুণ্যব্রতী প্রৌঢ়া বঙ্গজননীর পূর্ণতাই সূচিত হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আর একটি জননীচিত্র খুল্লনা। খুল্লনা ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়া পত্নী। 'বাঁঝি' (বন্ধ্যা) লহনা তাঁর জ্যেষ্ঠ সতিনী। এই সতিনীর ষড়যন্ত্রে তাঁকে 'খুঞার বসন' পরতে

হয়েছে, বনে বনে ছাগল চরাতে হয়েছে, সর্বোপরি বহন করতে হয়েছে অসতীর অপবাদ। আবার এই দুঃখ তাঁর সুখেরও কারণ হয়েছে। দুঃখের দহনজ্বালায় তিনি মঙ্গলচণ্ডীর কৃপালাভ করেছেন, বর পেয়েছেন, 'পতির প্রেমের ধামে হবে পুত্রবতী।' এই পুত্র শাপভ্রষ্ট মালাধর, মর্ত্য নাম শ্রীমন্ত বা ছিরা।

শ্রীমন্তকে কেন্দ্র করেই খুল্লনার মাতৃত্বের প্রকাশ। স্বামী বিদেশে দক্ষিণ পাটনে। ঘরে সতিনী। ভয়ে সন্ত্রস্তা জননী। ছেলে তাঁর 'নিধনের ধন' 'নয়নের তারা'। ছেলে চোখের আড়াল হলে তিনি চোখে অন্ধকার দেখেন, 'সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি করয়ে রোদন।' শিশু পুত্রের কান্দনে মায়ের সোহাগে বাৎসল্য ঝড়ে পড়ে। ছেলে একটু কেঁদে উঠলেই তিনি অবাস্তব কথাব ফুলে 'ছড়ার মালা' গাঁথেন—

আনিব তুলিয়া গগনফুল।
একৈক ফুলের লক্ষৈক মূল ॥
সে ফুলে গাঁথিয়া পরাব হার।
সোনার বাছনি কেঁদ না আর ॥

এক্ষেত্রে বাৎসল্য ছড়ার মায়ের মত কৌতুকরঙ্গে ভরা। ছেলের হাসি কান্না নাচ, সব তাতেই 'জননীর পরম কৌতুক'। কিন্তু এই বাৎসল্য সদা সশঙ্ক। এই শঙ্কায় খুল্লনার একমাত্র আশ্রয় চণ্ডীর আশীর্বাদ। তিনি মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতদাসী। খুল্লনার বাৎসল্যও চণ্ডীভক্তির রক্ষা করচে আবৃত। যে-কোন আপদে-বিপদে—'একভাবে সোঙরে রামা চণ্ডীর চরণ।' খুল্লনার ভক্তির পরীক্ষা দারুণ দুঃখের কষপাথরে।

স্বামী বিদেশে, ছেলের শিক্ষা দীক্ষার দায়-দায়িত্ব মায়ের। দনাই ওঝাকে ডেকে তিনি ছেলের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। শ্রীমন্তের

হাতেখড়ি হল। বয়স বাড়তে লাগল। ক্রমে ব্যাকরণে কাব্যে শাস্ত্রে স্নেহের ছিরা পণ্ডিত হয়ে উঠল। এই নিয়েই নতুন বিপত্তির সূচনা। একদিন গুরু-শিষ্যে বাঁধল তর্ক। অসহিষ্ণু উগ্র ব্রাহ্মণ শ্রীমন্তের জন্ম নিয়ে কটাক্ষ করলেন। অভিমানে ও কোপে কম্পিত শ্রীমন্ত সকলের অলক্ষ্যে 'দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল শয়নে।'

এদিকে স্নেহময়ী জননী ছেলের জন্য পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে বসে আছেন। চঞ্চল নয়নে তিনি রাজপথের দিকে তাকান; একবার যান রান্নাঘরে, আরেকবার অঙ্গনে। শেষে বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন মা। ভুলে গেলেন, তিনি সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ। উদল গায়ে বেরিয়ে এলেন প্রকাশ্য রাজপথে।

'শোকে গদগদ তনু হরিলা গেয়ান।
আকুল কুন্তল বাস রাজপথে যান॥'

বিরহ-বাৎসল্যে মতিভ্রম হতে লাগল। কখনও নিজের ছায়াকে 'ছিরা' মনে করে চমকে উঠতে লাগলেন। কখনও ভাবলেন, ছেলের গলার সোনার মালার লোভে হয়তো কোন অন্তেবাসী চোর ছিরাকে মেরে ফেলেছে। উন্মাদিনী আত্মহারা জননী অবশেষে উপস্থিত হলেন গুরুমহাশয়ের গৃহে। স্নেহে জ্ঞানহারা জননী ছেলের জন্য দায়ী করলেন মান্য শিক্ষককে। গুরু 'দোচারিণী' কুলকলঙ্কিনী বলে প্রকাশ্যে খুল্লনাকে তিরস্কার করলেন। হতাশ হয়ে জননী ফিরে এলেন গৃহে। সতিনীর কটাক্ষ বাক্যে জানলেন 'ঘরের পো ঘরে আছে।' শুনেই পুত্রোন্মাদ খুল্লনা ছুটলেন ঘরের দিকে। অনুনয়ে ঝরে পড়ল স্নেহের সকরুণ মিনতি।

শ্রীমন্ত দুয়ার খুলল। প্রথমে আত্মধিক্কার—

পণ্ডিত সমাজে যার পিতা পরিবাদ।
ধনজন বিফল জীবনে কিবা সাধ॥

কিন্তু ক্ষণপরেই কণ্ঠে বেজে উঠল তীব্র তীক্ষ্ণ অভিযোগের সুর ঃ স্বামী বিদেশে, তার বার্তা লও না কেন? 'কেমনে উদরে দেহ ভাত' 'কোন্ লাজে পরগো আয়াত?'

নিজ পুত্রের কণ্ঠে মাতৃ-কলঙ্কের এই ঘোষণা সে যুগে নতুন। জননীর পক্ষে এ এক অগ্নিপরীক্ষা। তবু খুল্লনা ধৈর্য হারান নাই। বাৎসল্যের বশবর্তী হয়ে তিনি নিজের দোষ ক্ষালনে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু পুত্র যখন বলেছে, 'পিতার উদ্দেশ আশে, চলিব সিংহল দেশে, সাত নায়ে করিয়া সাজন'—তখন স্নেহান্ধ জননী ব্যাকুল হয়ে তাকে বাধা দিতে চেয়েছেন। তাকে বুঝিয়েছেন সমুদ্র-পথের সঙ্কটের কথা। তবু পুত্রস্নেহের কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। শুধু পুত্রের মনস্তুষ্টির জন্য মা বাধ্য হয়ে বিঘ্নবিপদের মুখে সমুদ্র-যাত্রার অনুমতি দিয়েছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, খুল্লনার বাৎসল্য চণ্ডীভক্তির রক্ষাকবচে আবৃত। সম্পদে-বিপদে তিনি একান্তভাবে দেবনির্ভর। পুত্রের যাত্রাক্ষণে খুল্লনা যত্নে চণ্ডীর পূজা করেছেন, নিদর্শন স্বরূপ ছেলের হাতে পরিয়ে দিয়েছেন জাতপত্র অঙ্গুরী, মাথায় দিয়েছেন চণ্ডীর আশীর্বাদ 'অষ্টদূর্বা তণ্ডুল', আর মুখে বলেছেন—

দুর্গম পথেতে দুর্গা করিবে স্মরণ।
বিপদে সঙ্কটে তোরে করিবে রক্ষণ॥

এই দেব-নির্ভরতাই মাকে দিয়েছে ধৈর্য, বিরহে সান্ত্বনা। ভক্তির শক্তিতেই অপমান, কলঙ্ক, লজ্জা ও আশঙ্কাকে নির্জিত করে জয়ী হয়েছে খুল্লনার বাৎসল্য। ধর্মীয় চেতনা বঙ্গজননীর বাৎসল্যকে দুর্বল করে নাই, তাঁকে দিয়েছে অপার দুঃখসহন ক্ষমতা।

আর একটি মাতৃচিত্র ঃ মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তিনি আছাড়ি-পিছাড়ি করছেন। শিরে করাঘাত করে বলেছেন, দেবতার বরে

ছয় ছয়টি পুত্র পেয়েছিলাম। তাঁদের কেউ বেঁচে রইল না। কোন্ অভাগিনী মায়ের এমন পোড়া কপাল, একদিনে ছয় ছেলে হারায়! কে তর্পণ করবে? কে বংশে বাতি দেবে? ঘরে ছয় বৌ রাঁড়ী হল। তাদের নিয়ে কেমন করে ঘর করব? কোন্ পাপে এ সর্বনাশ হল? পুত্রহীনার জীবনে কি সাধ? ঘরে আগুন দিয়ে যোগিনী হব, বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করব।

কেঁদে কেঁদে মায়ের নয়ন অন্ধ। উচ্চ আর্তনাদে পুরী মুখর। কে প্রবোধ দিবে? কেমন করে প্রবোধ দিবে? এ শোকের সান্ত্বনাই বা কি?

ইনি মনসামঙ্গল কাব্যের মাতা সনকা। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে দুঃখিনী জননী। এমন চোখের জলের ছবি, মায়ের মুখে এমন করুণ সুরের লাচাড়ী অন্যত্র নাই। সনকার শোক মৃত্যু-শোক। সে মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, অপঘাত মৃত্যু। আর এ মৃত্যুর কারণ দেবে-মানবে বিরোধ। সে বিরোধের নেতা সনকার স্বামী—সঙ্কল্পে অটল চাঁদসদাগর।

চাঁদ বেনে চম্পকের অধিপতি। তিনি মহাজ্ঞানী, পরম শৈব। ধনেজনে পূর্ণ সংসার। তাঁর ছয় ছেলে। তিনি ঘটা করে তাদের বিবাহ দিয়েছেন। কিন্তু চাঁদ মনসার বিরোধী। মনসার রোষে তাঁর জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি হল। তাঁর 'নাখরা' বাগান বিষ বাষ্পে বিনষ্ট হল, তিনি মহাজ্ঞান হারালেন। শেষ পর্যন্ত মনসার চক্রান্তে বিষান্ন ভক্ষণ করে তাঁর ছয় ছেলে প্রাণ হারাল। এই নিয়েই শোকার্ত জননীর হাহাকার।

সনকার বাৎসল্য শোকে করুণ, আর্তনাদে মুখর। তাঁর রোদন সজল নয়, দগ্ধ মরুর হাহাশ্বাসের মত শুষ্ক। এ যেন হাঁপরের টানে কামার-শালার আগুনের হুতাশ। 'মুগধ' স্বামীর অবিবেচনা এ শোকাগ্নির মন্থন-অরণি। সনকার বাৎসল্য তাই সংঘাতে বিক্ষুব্ধ।

স্বামী বলেছেন, চাঁদ ও সোনাই বেঁচে থাকলে আবার সন্তান হবে। এ বাক্য 'গণ্ডবেদনাতে যেন মুদ্‌গরের ঘা।' রোষে গর্জন করে উঠেছেন সনকা, পতির সঙ্গে আজ থেকে তাঁর পিতার সম্পর্ক— 'চাঁদেরে বুলিছে বাপ্‌, গায়ের আগুনে।'

কিন্তু অতি সূক্ষ্ম দৈবী মায়ার গতি। তারও চেয়ে সূক্ষ্ম ও রহস্যময় নারীর সন্তান-কামনার গতি। যে সনকা পুত্রশোকে সন্তপ্ত, যে দেব-বিরোধী স্বামীর প্রতি আক্রোশে সন্তানলাভে অনিচ্ছুক, সেই সনকাই চাঁদের বাণিজ্য যাত্রাকালে আবার পাঁচ মাসের পোয়াতী। এই পুত্র বালা লক্ষ্মীন্দর। অন্তরের কোন্ অতলে ঘুমিয়ে থাকে স্নেহ। সন্তানজন্মের পূর্ব থেকেই তা ফল্গুর মত প্রবাহিত হতে থাকে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তা চন্দ্রোদয়ে স্ফীত সাগরের মত গগনচুম্বী হয়ে ওঠে। সনকারও তাই হল—

বৈসে সোনাই পুত্র করি কোলে।
স্নেহেতে অমৃত ভাষে,
দেখি মন্দ মন্দ হাসে
পূর্ণশশী বদনমণ্ডলে॥

এ সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। লখাই বড় হল। দৈবাহত হৃতসর্বস্ব স্বামী বাণিজ্য থেকে ফিরে এসেই দ্বিগুণ আক্রোশে মনসার সঙ্গে বাদে প্রবৃত্ত হলেন। 'বিভা-রাত্রে পুত্রের নাশের আছে ডর'— তবু বালা লক্ষ্মীন্দরকে তিনি বিবাহ দিবেন। শঙ্কিতা জননী বলেন, 'না দিব পুত্রের বিভা, থাকুক এমনে।' পিতার উত্তর, 'বান্ধিব লোহার ঘর সাঁতালি পর্বতে।' তবু সোনাইর ভয়। এ যেন কণ্টকশয্যায় লালিত মায়ের বাৎসল্য। শেষ পর্যন্ত সত্য হল ভবিতব্যের লিখন। নিরন্ধ্র লোহার বাসরে ছিদ্রপথে দুর্দৈব প্রবেশ করে লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করল। এ দংশন পুত্রের দেহে নয়, মায়ের হৃদয়ে। শুনে 'লখাই

লখাই' বলে তিনি মূর্চ্ছিতা হলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গে 'ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে গড়াগড়ি যায়।' বাসর ঘরের দুয়ার ভাঙা হল। আলুথালু জননী ছুটে ভিতরে প্রবেশ করে মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে 'ডোকর হারাইয়া যেন ডোকরে বাঘিনী।'

সনকার শোক, স্নেহ, ক্ষোভ, অভিযোগ ও আত্মধিক্কারে সকরুণ। কখনও বধূর প্রতি দোষারোপ 'খণ্ড কপালিনী বেহুলা', কে বলে বেহুলা রূপসী, এ যে রাক্ষসী। কখনও পতির প্রতি অনুযোগ— 'দেশের দুষমণ মনিসা চাঁদো অধিকারী;' কখনও আত্মধিক্কার—'মুঞি কর্মদোষী।' এ শোক স্নেহের সাগরে বাড়বানল। মৃত্যু দৈব, কিন্তু সনকার ক্ষেত্রে পুত্রের মৃত্যু তো দৈব নয়, পতির ঔদ্ধত্যের ফল। এ যেন দম্ভের নাগিনীচক্রে মাতৃত্বের পীড়ন।

সোনাইর দুঃখের এইখানেই শেষ নয়। সাধের পুত্রবধূ মৃত পতিকে নিয়ে গুঞ্জরীর জলে ভেসেছে, আবার মৃত পতিকে সঞ্জীবিত করে ছয় ভাসুর ও চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর নিয়ে চম্পাক নগরে ফিরেছে। চাঁদ সব ফিরে পেতে পারে, শুধু শর্ত—চাঁদ পদ্মার পায়ে ফুল দিক্। সেদিন বাৎসল্যময়ী জননী অনুনয়ে ভেঙে পড়েছেন, চোখের জলে স্বামীকে বলেছেন—

'একদিন পূজ তুমি জয় বিষহরি।
আপনার পুত্র তুমি আন আগুসরি॥'

মায়ের ক্রন্দনে অনড় সাধুর টনক নড়েছে, কুবুদ্ধি চাঁদের সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। কিন্তু সনকার দুঃখ ঘোচে নাই। কঠিন সমাজের নিয়ম। বেহুলা মৃত পতিকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। তাই তার সতীত্ব নিয়ে জাগল প্রশ্ন। সতীত্ব পরীক্ষার আয়োজন হল। তুলা পরীক্ষা দিতে গিয়ে বেহুলা অন্তর্ধান করল, সেই সঙ্গে পুত্র লক্ষ্মীন্দর। সোনাই 'আজি সে মরিল মোর পুত্র লক্ষ্মীন্দর' বলে

ভূমিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন, 'কণ্ঠে প্রাণ নাহি রয়ে বুকে নাই শ্বাস।'

এ মৃত্যু নয়, মৃত্যুর অধিক। চিতাগ্নি মৃতকে দগ্ধ করে, শোকাগ্নি তুষানলের মত জীবিতকে দগ্ধ করতে থাকে।

শোকের কণ্টক-মৃণালে সনকার বাৎসল্য প্রস্ফুটিত পদ্ম, কিন্তু সে পদ্ম শীতকালের পদ্মের মত বিবর্ণ ও ম্লান। বিষচক্রে কবলিত বিষ-দিগ্ধ এই শোক-করুণ মাতৃমূর্তি সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত।

মনসামঙ্গল কাব্যের আর একটি দুঃখিনী জননী বেহুলার মাতা সুমিত্রা। তাঁর ছয় ছেলে, এক মেয়ে। ধনে জনে তাঁর সুখের সংসার। কিন্তু পাঁচ আঙুলের একটি আঙুল ক্ষত হলেও যেমন সে বেদনা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই এক কন্যা বেহুলার করুণ জীবন, সুমিত্রার জীবনকেও বিষনীল করে তুলেছে। তাঁকে মৃত্যুশোক সহ্য করতে হয় নাই, কিন্তু কন্যার দুর্ভাগ্যে তিনি যে মর্মযন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তা মর্ম বিদারী।

তাঁর কন্যারত্ন একটি, সে বেহুলা। বেহুলা তাঁর 'আচলের সোনা'। এই কন্যার সঙ্গে যখন লখাইর বিয়ের প্রস্তাব এল, তখন মা বেঁকে বসলেন—

সুমিত্রা বলেন বিভা না দিব তথাই।
বিভারাতে সর্পাঘাতে মরিবে লখাই॥

কিন্তু স্বামীর কাছে তেজ দেখালেও মাকে মেয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হল। বেহুলা যখন মাকে বুঝাল, 'ললাট লিখন কভু না যায় খণ্ডন', তখন দৈবনির্ভর বঙ্গ-জননী যুক্তি হারিয়ে ফেললেন।

বেহুলার বিবাহে সুমিত্রার স্ত্রী-আচার, আনন্দ-উল্লাস আর দশজন বাঙালী মায়ের মতই। তিনি যথাবিধি সোহাগ মাগলেন, বিবাহ সভায় বরার্চন করলেন, 'মঙ্গলশরা কাঁখে লইয়া হাতে ঘৃত দীপ।'

বিবাহান্তে জামাইকে পরিতুষ্ট করে ভোজন করালেন। এই মা-ই আবার বিদায়-বেলায় 'মনের দুঃখে করেন ক্রন্দন।' তবু দুঃখের মধ্যেও মেয়েকে নীত-উপদেশ দিতে ভুললেন না। আর এই নীত-উপদেশে ঘোষিত হল চিরকালের বঙ্গ-জননীর অন্তরের সৌভাগ্য কামনা—

সাত নাতীর মা হইও শতেক বৎসর জিও
সিঁদুর পরিয়া পাকা কেশে।

কিন্তু সে আশা পূর্ণ হল না। দৈবের নির্বন্ধে সর্পাঘাতে লক্ষ্মীন্দর জীবন হারাল। সতী বেহুলা মৃত পতিকে নিয়ে ভাসল অনন্তের উদ্দেশ্যে। সংবাদ সুমিত্রার কানে পৌছাতেই তিনি হাহাকার করে উঠলেন।

সর্বংসহা জননী এই বিরহাগ্নি বুকে পোষণ করে বহুদিন কাটিয়েছেন। হয়তো প্রতীক্ষা করেছেন, মেয়ে আবার ফিরবে। ফিরেছেও। কিন্তু ছদ্মবেশে। বেহুলা যখন মর্ত্যকাজ শেষ করে মনসার রথে স্বর্গে যাচ্ছেন, তখন ইচ্ছা হল, মাকে দেখে যাবেন। কিন্তু কন্যার বেশে দেখা দেওয়া সম্ভব হল না, দেখা দিলেন 'যুগিনীর-বেশে'। কেউ তাকে চিনতে পারল না, মা-ও নয়। যাবার সময় বেহুলা রেখে গেলেন পরিচয়-পত্র। তখন সুমিত্রার সে কি দুঃখ—

সুমিত্রার ক্রন্দনে বৃক্ষের পত্র ঝরে।
আছুক অন্যের কাজ পাষাণ বিদরে॥

বাৎসল্যময়ী মায়ের এ দুঃখের শেষ কোথায়? সন্তানকে চাক্ষুষ স্বর্গে যেতে দেখলেও সন্তান-বিরহে মায়ের দুঃখ উত্তাল হয়। বিরহ-দগ্ধ বাৎসল্য সান্ত্বনার অতীত।

ধর্ম-মঙ্গল কাব্যে একদিকে অগ্নি-অক্ষরে বর্ণিত হয়েছে বীর বাঙালীর বীরত্বের কাহিনী, আর একদিকে চিত্রিত হয়েছে রক্তক্ষরা মাতৃ-হৃদয়ের চিত্র। একদিকে রণদামামার নির্ঘোষ, অপরদিকে বাৎসল্য-নির্ঝরের কলধ্বনি। সে মিশ্ররাগিণী কঠোরে-কোমলে রুচির ও মধুর। বাৎসল্য-স্নিগ্ধ হৃদয় চিরকাল স্ফটিকের মত শুভ্র। কিন্তু রক্ত-পীতাদি বর্ণের আশ্লেষে তা নানাবর্ণে অনুরঞ্জিত হয়। বাংলার ধর্মমঙ্গল কাব্য এই বহুবর্ণা মাতৃ-হৃদয়ের প্রতিমা-গৃহ।

এই মাতৃ-প্রতিমার পুরোভাগে রয়েছেন জননী রঞ্জাবতী। তিনি স্বর্গের নটিনী। ধর্মপূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে মর্তো বেণু রায়ের ঘরে তাঁর জন্ম। তাঁর ভাই কূট কৌশলী মহামদ, বোন গৌড়েশ্বরের পাটরানী। মহামদের অনুপস্থিতিতে গৌড়েশ্বর বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জার বিবাহ দেন। তাতেই মহামদের ক্রোধ। বৃদ্ধ-বন্ধ্যা সংঘটনকে মহামদ মানতে পারে নাই। রঞ্জার মাতৃত্বের উগ্র আকাঙ্ক্ষাও ভ্রাতার দুর্বচনের ফল। একবার কর্ণসেন গিয়েছিলেন গৌড়ে। রাজসভার সকলের সামনে মহামদ তাঁকে অপমান করল 'আঁটকুড়' বলে, রঞ্জাকে দিল 'বাঁজি' অপবাদ। শুনে রঞ্জার জরজর তনু –

ভ্রাতার বচন বাণে বিদরিল বুক।
খেতে শুতে বসিতে উঠিতে নাই সুখ॥

সেই থেকে তাঁর এক চিন্তা, কবে কোলে পো হবে, কবে ঘুচবে বন্ধ্যা অপবাদ। সন্তান কামনায় ব্যাকুল রঞ্জা ব্রত-আর্চা করেন, তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে মাথা কোটেন, 'কত ঠাঁই বাচা বান্ধে

করিয়া মানন।' শেষ পর্যন্ত তিনি শুনলেন, 'শ্রীধর্মপূজায় রঞ্জা হবে পুত্রবতী।'

কিন্তু ধর্মের ঘর তো সহজ নয়। অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য চাঁপাই সেবন বা ধর্মের 'ঘরভরা গাজন'। তাতে আমিনা ভকিতা সহ সাংযাত করতে হয়, উপবাসী থেকে সন্ন্যাস নিতে হয়, কঠোর নিয়মব্রতে বাণ ফুঁড়তে হয়, শালে ভর দিতে হয়। কাঠের লম্বা পাটে গাঁথা থাকে তীক্ষ্ণ সূচীমুখ লোহার শালকাঁটা। ব্রতধারিণীকে তার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হয়। তাতে জীবন সংশয় হয় সত্য কিন্তু তুষ্ট হন ধর্মঠাকুর। রঞ্জা সেই কঠিন ব্রতে ব্রতী হলেন।

পুত্রকামনায় রঞ্জার ধর্মব্রত বাঙালী মায়ের সুকঠিন তপশ্চর্যার এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সন্তান যে দুশ্চর সাধনার ধন, সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন পুত্রকামা রঞ্জাবতী। ব্রতের আয়োজন নিয়ে রঞ্জা নৌযাত্রা করে এলেন চাঁপায়ের ঘাটে। সঙ্কল্প করে বার দিনের 'বার্মতি' শুরু হল। চারদিকে ধূপ-ধূনা, জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি, ঢাকের বাদ্য। একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রঞ্জা কেঁদে প্রার্থনা করলেন—

'ওহে ধর্মঠাকুর দিনের দিবাকর।
বিনয় করিয়া মাগি এক পুত্র বর॥'

ধূনার আগুনে অঙ্গ জ্বলে যায়, রঞ্জা তবু টলেন না। হিন্দোলাতে তিনি অনাহারে রইলেন। তাতেও ফল হল না। তখন কোমরে কাপড় বেঁধে রানী 'আগুন সন্ন্যাস' করলেন, পাট ভাঙলেন, উচ্চ মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়লেন হীরাতুল্য ধার অর্ধচন্দ্র বাণের উপর। বাণ বুকে লেগে খানখান হয়ে গেল। রঞ্জার মুখে শুধু এক প্রার্থনা, 'এক পুত্র বর মাগি প্রভু নিরঞ্জন।'

তবু ধর্ম সদয় হলেন না। এবার চরম পরীক্ষা 'শালে ভর'।

তেকাঠার উপর বিষম শালের কাঁটা, সর্পজিহ্বার মত ভয়ঙ্কর, সূর্যের মত জ্বলন্ত, পাবক সমান ধার। রঞ্জা পুত্রলাভের উগ্র আকাঙ্ক্ষায় তার উপর ঝুপ করে ঝাঁপ দিলেন। 'বুকেতে বাজিল বাণ পৃষ্ঠ হৈল পার।' শুধু তাই নয়, 'নাকে মুখে রুধির ভাসিল চারিভাগে।' জীবন যায়। চতুর্দিকে ক্রন্দনধ্বনি উঠে। স্ত্রীহত্যার পাপ হয় দেখে ধর্মঠাকুর সদয় হলেন, বর দিলেন, 'পুত্র কোলে পাবে বাছা কশ্যপতনয়।'

রঞ্জার সুকঠিন ব্রতচর্যার ফল—পুত্র লাউসেন। এই পুত্র পেয়ে রঞ্জা আনন্দসাগরে ভাসলেন। খবর পাঠানো হল গৌড়ে। আক্রোশে ফেটে পড়ল পাত্র মহামদ, 'মুহূর্তে অধিক হৈল মাহুত্থার দুঃখ।' সে প্রতিজ্ঞা করল, আজ থেকে রঞ্জা হল দেবকী, মহামদ কংস। ভাগিনেয়ের অনিষ্ট চিন্তায় কংসের মতন ভয়াল হয়ে উঠল মাতুল মহামদ।

লাউসেনকে নিয়ে রঞ্জার সশঙ্ক বাৎসল্যের প্রকাশ এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে। মহামদের চক্রান্তে শিশু লাউসেনকে হরণ করা হয়েছে। রঞ্জা হয়ে উঠেছেন ব্যাকুলী আদুড়চুলী শোকাকুলী। আবার পুত্রকে কোলে পেয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়েছেন। পরম স্নেহে বুকে আঁকড়ে ধরেছেন স্নেহের দুলালকে। শিশু লাউসেনকে নিয়ে রঞ্জার আনন্দ-উল্লাস ছড়ার মায়েদের মতই তৃপ্তি-সুখে ভরা।

রঞ্জার কাছে ছেলে যেন 'কৃপণের কড়ি'। তাই স্নেহান্ধতাও তাঁর চরম। লাউসেন বড় হল, নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল। বিদ্যা জাহির করতে সে যাবে গৌড়ে। শুনে মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। অন্ধ স্নেহ সন্তানকে দূরে পাঠাতে চায় না। এ বিষয়ে রঞ্জার মোহমুগ্ধতা স্নেহান্ধ সকল বাঙালী মাকে হার মানিয়েছে। ছেলে যাতে দূরদেশে যেতে না পারে, তার জন্য মা চক্রান্ত করে মল্ল আনিয়ে ছেলেকে খোঁড়া করে ঘরে আটকে রাখতে চেয়েছেন। বলেছেন—

চরণ ভাঙিলে ঘুচে গমনের আশ।
ঘরে বসে চাঁদমুখ দেখি বার মাস॥

বাঙালী মায়ের এই অতি স্নেহের অন্ধতার দৃষ্টান্ত বাংলার মায়েদের হাস্যাস্পদ করে তুলেছে। বাস্তবে ঠিক এরূপ দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। খুব সম্ভব বাঙালী জননীর স্নেহান্ধতাকে নিয়ে রঙ্গ করার উদ্দেশ্যে কবির কল্পনায় এমন উদ্ভট চিত্রের উদ্ভব হয়েছে।

রঞ্জার স্নেহ দুর্বল বটে, কিন্তু এই স্নেহই আবার বীর সন্তানের ধাত্রী। সে সন্তান দুর্দান্ত ব্যাঘ্রকে বধ করেছে, মদমত্ত কুঞ্জরকে দমন করেছে, ইছাই ঘোষের মত শক্তিমদগর্বীকে নিহত করেছে, এক কোপে লোহার গণ্ডারকে চূর্ণ করেছে। শুধু দৈহিক শক্তি নয়, নৈতিক শক্তিবলে লাউসেন, মোহিনী সুরিক্ষা নটিনীর মোহকে পর্যন্ত জয় করেছে। এই দৈহিক ও মানসিক শক্তির উৎস কি দুর্বল স্নেহ? রঞ্জা বীর সন্তানের জননী। তাঁর মধুস্নেহ বিগলিতও করে, সময় বিশেষে মত্ততাও সঞ্চার করে। পুত্রের রণ-যাত্রার সংবাদে তিনি যেমন বিরহ-বেদনায় ম্রিয়মাণ হয়েছেন, আশঙ্কায় ভেঙে পড়েছেন, তেমনই আবার পুত্রের বিজয় বার্তায় উল্লসিত হয়ে তাকে অভিনন্দিত করেছেন। রঞ্জার বাৎসল্য এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, বাংলার মা স্নেহকাতর হলেও পুত্রের গরবে গরবিনী। তাঁরা মর্মে মর্মে এ সত্য অনুভব করেন—

'সুবৃক্ষ চন্দন বৃক্ষে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন॥'

রঞ্জার বাৎসল্য বিপদে শক্তি সংগ্রহ করেছে দেবনির্ভরতায়। বাঙালী মায়ের ধর্মনিষ্ঠা তাঁদের স্নেহদুর্বল হৃদয়ের শক্তি কবচ। এই কবচ দুঃখের অগ্নি পরীক্ষায় তাঁদের বিজয়িনী করে তোলে। রঞ্জাও ধর্মের পায়ে ভরসা রেখে পুত্রকে বিপদের মুখে পাঠিয়েছেন। তাঁর

হৃদয়বলের চরম পরিচয় লাউসেনের ‘হাকন্দ সেবন’ যাত্রায়। মহামদের কুপরামর্শে লাউসেনকে পশ্চিমোদয় করতে বলা হয়। এ এক অসম্ভব সাধন। তাতে ধর্মের চরণে জীবন আহুতি দিতে হয়। লাউসেনের মত বীরও তাতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। ফলে পাত্রের নির্দেশে লাউসেনকে বন্দীশালে বন্দী করা হয়েছে। মুক্তির শর্ত—বাপমাকে কারাগারে জামিন রেখে অসাধ্য পশ্চিমোদয় করতে হবে। শুনে ময়নানগরে যখন হাহাকার জেগেছে, তখন রঞ্জাই সকলকে প্রবোধ দিয়ে বলেছেন, ‘সত্ত্বগুণী সিদ্ধ বাছা সাধিবে সে কর্ম।’ রঞ্জাই উদ্যোগ করে স্বামীকে নিয়ে গৌড়ে গিয়ে কারাবরণ করেছেন, পুত্রকে সাহস দিয়ে পাঠিয়েছেন হাকন্দসেবনে। মুখে বলেছেন, ‘বুক বাঁধ বিপত্তে বিষাদ অকারণ’, ‘চিন্তা নাই হাকণ্ডে পশ্চিম উদয় হবে।’ সত্য হয়েছে মায়ের মুখের ঋতম্ভরা বাণী। পুত্র অসাধ্য সাধন করে ফিরে এসেছে। প্রথমেই ছুটে গিয়ে বন্দনা করেছে জননীর চরণ। সেদিন দুঃখের সাগরে আনন্দের লহরী। ছেলের চাঁদ মুখে চুম্ব দিয়ে মা প্রচুর প্রেমে হর্ষে গর্বে আত্মহারা হয়েছেন।

ধর্মমঙ্গলকাব্যের আর এক বীরপ্রসূ বীরাঙ্গনা লক্ষ্যা ডোমনী। সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মাতৃচিত্রে এ চরিত্র অপ্রতিম। গ্রামগীতিকার বীরাঙ্গনা সখিনা চরিত্রের সঙ্গে এ চিত্রের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। সখিনা প্রেমিকা, লক্ষ্যা জননী। প্রেমের জন্য রণে আত্মবিসর্জন দেওয়া সহজ, কিন্তু আত্মা অপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া ভয়ঙ্কর কঠিন। বাঙালী মায়ের এই সুকঠিন কর্ম সাধন করেছেন ডোম-রমণী, শাকা-শুকার জননী লক্ষ্যা।

বাংলার মা কোমল কমনীয়। তাঁদের বুকে নদীমাতৃক মাটির স্নেহধারা। কিন্তু সময় বিশেষে এই মা-ই কালবৈশাখীর মেঘের মত বজ্রধরা। তাঁর চোখে বিদ্যুতের খরদৃষ্টি, কণ্ঠে অশনি গর্জন। বাংলার মা পরমস্নেহে আঁচলের সোনাকে আঁচলে বেঁধে রাখেন, আবার প্রয়োজন হলে মরণান্তিক রণে পুত্রকে রণসাজে সাজিয়ে দেন।

লক্ষ্যা কালু ডোমের ঘরনী। কালুর বীরপনা দেখে লাউসেন তেরঘর ডোম সহ তাকে ময়নাগড়ে এনে বাস্তু দিয়েছিলেন। ময়নাগড়ে কালু ছিল সৈন্যদলের নেতা। পশ্চিমোদয় যাত্রাকালে লাউসেন এই কালুর উপর রাজ্য রক্ষার ভার অর্পণ করেন। লক্ষ্যাকেও বলেন—

'যাবত না আসি দেশে দশা থাকে হীন।
তাবত করিবে রক্ষা রাজ্যে রাত্রিদিন॥'

লক্ষ্যা সেনের সামনে 'আজ্ঞা অঙ্গীকার করে যোড়হাত বুকে।' লক্ষ্যার প্রতিজ্ঞা শুধু মুখে নয়, কাজে। মনে মুখে কর্মে সে একচারিণী। লাউসেনের অনুপস্থিতিতে কৌশলী মহামদ, যখন ময়নাগড় অবরোধ করল, তখন লখের ভূমিকাই সবচেয়ে সক্রিয়। মহামদ কালুকে প্রলোভিত করল। প্রলোভন দেখাল লক্ষ্যাকে। লক্ষ্যা ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন, 'শুধিব সেনের লুণ সাধিব সাধনা।' নগরে নিদাটি লাগাল প্রতিপক্ষ। সমগ্র ময়নাগড় সুপ্তিমগ্ন। কালু মদের ঘোরে অচেতন। কেবল চোখে ঘুম নাই লক্ষ্যার। 'এক লক্ষ্যা সমরে হইল আটখান।' রাত্রির অন্ধকারে ময়নাগড়ে রুধিরের নদী বয়ে গেল। রণধুলি রুধিরে ভূষিত হয়ে লক্ষ্যা স্বামীর কাছে এলেন। কিন্তু কালুকে চিয়ানো গেল না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি এলেন বড় বেটা শাকার কাছে। ঘুম থেকে জাগিয়ে তাকে বললেন—

'রিপু জিনি রাখ বাপু ভূপতির রাজ্য।
লাউসেন রাজার লুণের কর কার্য ॥'

লক্ষ্যা মাতা। স্নেহপ্রবণ হলেও ধর্ম ও নীতিবোধে তিনি অটল। রাজকর্তব্যের কাছে তিনি পুত্রস্নেহ বিসর্জন দিয়েছেন। বীরাঙ্গনার রক্তে তখন জেগে উঠেছে রাজ্যরক্ষার নেশা। শাকা যখন যুদ্ধে যেতে সামান্য ইতস্তত করেছে, তখন লক্ষ্যার কণ্ঠে অগ্ন্যুদ্গার —

'মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি।
তু বেটা তখনি কেন হয়ে না মরিলি ॥'

শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে বীর জননীর ইচ্ছা। পুত্র যখন রণে সম্মতি দিয়েছে 'তখন লখের নয়নে বহে নীর।' মনে মনস্তাপ, তবু জননী আশীর্বাদ করে পুত্রের মুখচুম্বন করে তাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন।

বীর জননীর বাৎসল্য মরণশঙ্কায় ভীত, অথচ উৎসাহে উদ্দীপ্ত। এ বাৎসল্য একই আধারে করুণ ও বীর রসের আশ্রয়। লক্ষ্যার শোক উতল হয়ে উঠেছে শাকার মৃত্যু-সংবাদে। প্রথমে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নাই যে, তাঁর বীর পুত্র রণে নিহত হয়েছে। কিন্তু শিঙ্গাদার যখন শাকার কাটামুণ্ড তাঁর কোলে দিয়েছে, 'অমনি পড়িল লখে আছাড়িয়া গা।' মর্মভেদ করে জাগল বাৎসল্যের ক্রন্দন —

বাছা কোথা আমার আমার দুলালিয়া।
মড়া মাথা নিয়া কান্দে মুখে মুখ দিয়া ॥

তবু লক্ষ্যার ধৈর্য অসাধারণ। বীর জননী অনলউত্তাপে স্নেহকে পোষণ করেন। শাকার কাটামুণ্ড সোনার খাটে রক্ষা করে তিনি জাগিয়ে তোলেন ছোট পো শুকাকে; 'ছোট পো শুকায় ডাকে

চক্ষে বহে নীর।' ভায়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে শুকা অধীর, তাকে প্রবোধ দেন সন্তপ্তা জননী। উৎসাহব্যঞ্জক ভাষায় প্ররোচিত করে বলেন, 'শোক ত্যেজে সমরে ভেয়ের ধার শোধ।' শুকা মায়ের আজ্ঞা অমান্য করে নাই। কিন্তু লক্ষ্যাকে এ পুত্রেরও মৃত্যু-সংবাদ শুনতে হয়েছিল। তখন শাবকহারা বাঘিনীর মত লক্ষ্যার ক্রন্দন, 'হাহাকার করে লখে কান্দে উভরায়।' শোকের উপরে শোক, বুকে শিলার উপর শিলার আঘাত। বীর জননীর নয়নে নীরের বিশ্রাম কোথায় ?

বীর মাতার স্নেহের প্রকাশ দীনতার নয়, বীরত্বের গৌরবে। মৃত্যুর বজ্রহুঙ্কারেও এ বাৎসল্য নিঃশঙ্ক। আঘাতে হৃদয়ে রক্ত ঝরে, চোখে ঝরে অশ্রুর সহস্রধার, বুকে তপ্তশ্বাসের ঝড়, কণ্ঠে জাগে হাহাকার। বীর সন্তানের মাতা এই অশ্রু-উত্তাপ ও মর্মযন্ত্রণায় রক্তাপ্লুত বাৎসল্যকে পোষণ করেন। বাংলার কোমল মৃত্তিকায় এ বাৎসল্যও অসুলভ নয়। তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ধর্মের ব্রতদাসী অন্তেবাসী ডোমনী লক্ষ্যা।

উপসংহার

পুরানো বাংলা সাহিত্যে মায়েদের কথা এইখানেই শেষ হল। এই কথাগুলি শুনে কেউ কেউ হয়তো বলবেন, বঙ্গের জননী-কথা বড় একঘেয়ে। জলপথে বেড়াতে বেরিয়ে, কেবল জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেমন চোখ ক্লান্ত হয়ে আসে, তেমনই স্নেহ-হৃদয়, স্নেহজলে সিক্ত বঙ্গের মাতৃ চিত্রগুলিও একটি মাত্র রসের আস্বাদনে ক্লান্তি সৃষ্টি করে। তা ছাড়া এ মাতৃস্নেহের ক্ষেত্রও বহু প্রসারিত নয়। পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ।

এ অভিযোগ অসত্য নয়। বাংলাদেশ মাতৃতান্ত্রিক দেশ হলেও, মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মত এখানে মায়ের কর্ত্রীত্ব পারিবারিক জীবনের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে না। তার প্রধান কারণ, বাংলাদেশে পুরুষ-প্রধান আর্যসমাজের প্রভাব। এই প্রভাব সমাজের উচ্চস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। সেখানে কর্মের বহিরঙ্গন থেকে মায়ের অধিকারকে হরণ করা হয়েছে। মায়ের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে পরিবারের মধ্যে। পরিবারের মধ্যেও মা অনেকটা পরাধীন ও পুরুষের মুখাপেক্ষী। বঙ্গের জননী যে স্নেহভীরু, তার একটি কারণ এই বন্দীত্ব।

তবু এরই ভিতর মা যতটা সম্ভব তাঁর স্বাধীন সত্তাকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। যেখানে বন্ধন কিছুটা শিথিল, সেখানে মাকে ঘরের বাইরেও দেখা গিয়েছে। ব্যাধজননী নিদয়া মাংসের পসরা নিয়ে হাটে যান, লক্ষ্যা ডোমনী সমরসাজে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হন। যাঁরা বাইরে যেতে পারেন না, সংসারের মধ্যে থেকেই তাঁরা বাৎসল্য-বিভূষিত কর্মমূর্তিকে প্রকাশ করেন। 'স্বাধীনে অধীন তুমি, অধীনে

স্বাধীন'—বাঙালী মা সম্পর্কে এ উক্তি সত্য। শিশু-সন্তানের লালনে পালনে মা সর্বেসর্বা; যে-কোন উৎসবের স্ত্রী-আচার অংশে মায়েরাই নেত্রী; ব্রত-অনুষ্ঠানে মা-ই ঋত্বিক, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা।

সীমিত গণ্ডীর মধ্যে প্রকাশিত মাতৃস্নেহ বৈচিত্র্যহীনও নয়। সাগর-হৃদয়ে তরঙ্গ-শোভা যেমন বহুবিচিত্র, কখনও ধীর, কখনও উত্তাল—কখনও তার মধুর কুলুকুলু রব, কখনও গম্ভীর গর্জন, কখনও ক্ষুব্ধ রুদ্র হুঙ্কার—বঙ্গ-জননীর স্নেহ-সাগরেও তেমনই বহু বৈচিত্র্যের সমাবেশ। স্থায়ী ভাব সন্তান-স্নেহ, কিন্তু পরিবেশভেদে তাঁর অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব শুধু তেত্রিশ নয়, অনন্তকোটি। পুত্র সন্তানকে নিয়ে এ স্নেহের একরকম প্রকাশ, আবার কন্যা সন্তানকে নিয়ে প্রকাশ ভিন্নতর। শিশুকে কেন্দ্র করে স্নেহের যে উৎসার, কিশোর-কিশোরী বা যুবাপুত্র বা যুবাবতী কন্যাকে নিয়ে তার প্রকাশ ও ব্যাপ্তি স্বতন্ত্র। হর্ষে, উদ্বেগে, দৈন্যে সে স্নেহচিত্রের সংখ্যা অসংখ্য।

সত্যই অতি বিচিত্র বঙ্গসাহিত্যের জননী-কথা। পুরানো সাহিত্যের কথা হলেও সে কথা চিরন্তনী। মাতৃ হৃদয় কোন কালের সীমায় আবদ্ধ নয়। বিশেষ কাল, বিশেষ চিহ্নে তাকে চিহ্নিত করতে পারে, কিন্তু মাতৃভাবের স্বার্থলেশহীন আত্মলুপ্ত মহিমা কালাতিসারী। 'বাংলা সাহিত্যে মা' মায়ের সেই কালজয়ী মহিমার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছে।

॥ সমাপ্ত ॥